হাত বাড়ালেই

সুবিধা

Suvida

বিশেষ পুজো সংখ্যা

শারদ উৎসব

রেসিপি

সেলেব্রিটি

গল্প

ফ্যাশন

বেড়ানো

আইনি

ভাগ্য

স্বাস্থ্য

সম্পাদক
সুদেষ্ণা রায়
মূল উপদেষ্টা
মাসুদ হক
সহকারী সম্পাদক
প্রীতিকণা পালরায়
শিল্প উপদেষ্টা
অন্তরা দে
প্রকাশক
এসক্যাগ সঞ্জীবনী প্রা. লি.
মূল্য
১০ টাকা
মুদ্রণ
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড

আমাদের ঠিকানা
এসক্যাগ ফার্মা প্রা. লি.
পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক - বি
কলকাতা ৭০০০৮৯
email- eskagpha@vsnl.com

প্রচ্ছদ
সন্দীপ্তা সেন-এর ছবি তুলেছেন আশিস সাহা

অন্দরে

চিঠি পত্র ও শব্দজব্দ	৪
সম্পাদকীয়	৫
তুমি মা	৬
কথা ও কাহিনি ১	৮
আইনি	১১
কাছে-দূরে ১	১২
ডাক্তারের চেম্বার থেকে	১৪
প্রচ্ছদ কাহিনি	১৬
পুজোর পোশাক	২২
কাছে-দূরে ২	২৬
সেলিব্রিটি সংবাদ	৩০
কথা ও কাহিনি ২	৩২
নিজে করো	৩৫
বিনোদন মশলা	৩৬
শরীর স্বাস্থ্য	৩৮
গৃহসজ্জা	৪০
ভূত-ভবিষ্যৎ	৪২

৩৬
বিনোদন মশলা

৩০
শ্রাবন্তীর সঙ্গে আড্ডা

১৪
ডাক্তারের চেম্বার থেকে
স্তনের সমস্যা সমাধানে পিল এর ভূমিকা

১৬
প্রচ্ছদ কাহিনি

সুবিধা ৩

কাছে দূরে ২
২৬
মায়াময় প্রকৃতির অনন্যরূপ

পোশাকিবাহার
২২
পুজোর পোশাক

তুমি মা
শিশুর প্রতিরক্ষায় প্রো বায়োটিক
৬

চি ঠি প ত্র

সুবিধা আমাদেরই

‘সুবিধা’র সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাতে চাই। বর্ষা সংখ্যা’র ‘সুবিধা’ই আমি প্রথম দেখলাম। আর প্রথম দেখাতেই মুগ্ধ। মহিলা হিসেবে প্রচ্ছদের বিষয়টাই প্রথমে টেনেছিল। দ্রুত পরেও ফেললাম এবং জেনে নিলাম বহু তথ্য যা অজানা ছিল। বাকি বিভাগগুলোও ভীষণ balanced আর পড়তেও ভাল লাগে। এমন একটা পত্রিকা নিয়মিত পেতে চাই। কারণ এতে এমন কিছু বিষয় আছে যা পড়লে ‘সুবিধা’ আমাদেরই।

পারমিতা বৈদ্য
যাদবপুর

গল্প পেয়ে ভাল লাগল

‘সুবিধা’র দ্বিতীয় সংখ্যাটিও হাতে পেলাম। প্রথম সংখ্যার মুগ্ধতা আরও বাড়ল। পাঠকদের প্রত্যাশা ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছেন সম্পাদক। তবে সবার আগে বলি, আস্ত একখানা গল্প উপহার পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছি। সুব্রত সেন-এর গল্পটিও ভাল লেগেছে। আশা রাখি ‘সুবিধা’ আমাদের দুর্দান্ত একটা পুজো সংখ্যা উপহার দেবে।

মিলন রায়,
সোনামুখী, বাঁকুড়া

সবার জন্যই ‘সুবিধা’

প্রথম এক ঝলক দেখে ‘সুবিধা’কে মেয়েদের পত্রিকা বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু হাতে নিয়ে দেখলাম সবার পড়ার মতো বিষয়ই মজুদ আছে এতে। ‘কথা ও কাহিনি’ বিভাগটি তো গল্প পড়ুয়াদের ভাল লাগবেই। এছাড়া ‘নানামত’ বিভাগটিও দুর্দান্ত। বিষয়টিও ভাল। ‘সুবিধা’র উন্নতি কামনা করি।

মানব নস্কর
হুগলি

বিনোদন মশলা বেশি চাই

প্রিয় সম্পাদককে ধন্যবাদ ‘সুবিধা’র কলেবর বাড়ানোর জন্য। ‘ঘরে বসে রোজগার’ বিভাগটি আমাদের মতো গ্রামের ছেলেদের কাজে লাগবে। দু’টি সংখ্যাই পড়লাম। বেশ ভাল। একটা আর্জি জানাতে চাই। ‘বিনোদন মশলা’ আরও একটু বাড়ানো যায় কি? সিনেমা-টেলিভিশন-এর খবর জানতে সবারই ভাল লাগে। যদিও ‘সেলিব্রিটি সংবাদ’ বিভাগটি পড়ে আমাদের প্রিয় মানুষগুলো সম্পর্কে জানতে পারছি। অপেক্ষায় রইলাম পরের সংখ্যাটির জন্য।

রূপম বিশ্বাস
সাতগাছিয়া

শব্দজব্দ ২ ছকে ভরা দুর্গাটুর্গা শ্যামদুলাল কুণ্ডু

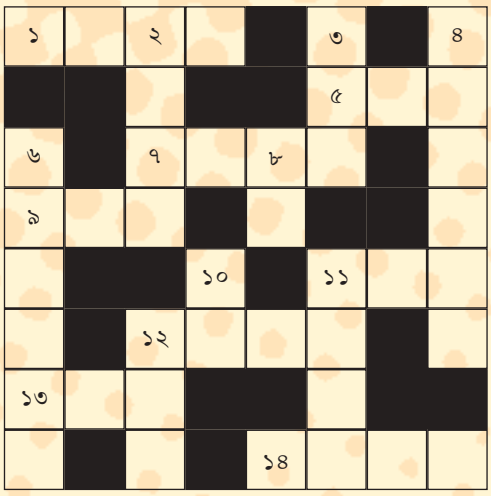

পাশাপাশি

১। আদ্যাশক্তি, দুর্গাদেবী বা অতি পরাক্রান্ত। ৫। দেবতার স্তুতি ও মহিমাকীর্তন, আরাধনা। ৭। দুর্গা, সেই ‘অপু-দুর্গার মা’। ৯। পুষ্পময়, পঞ্চশরের দেবতা, মহাদেবের দর্পচূর্ণ করায় এঁর নাম হয় কন্দর্প। ১১। মহিষাসুর বধে দেবীদুর্গাকে দেওয়া মহাদেবের অস্ত্র। ১২। দেবতা আবির্ভাবের জন্য আহ্বান। ১৩। সূর্যের এক নাম, আগে বরাহ বসলে এক নবরত্ন। ১৪। শাশ্বত, শিব-এর স্ত্রীশব্দ, অর্থ দুর্গা সরস্বতী বা লক্ষ্মী।

উপরনিচ

২। দেবসেনাপতি বা কার্তিকের প্রহরণ। ৩। ভয়দূরকারিনী দেবী দুর্গা। ৪। অসুরবিনাশিনী দুর্গা। ৬। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বর্ণিত দুর্গার এক রূপ। ৮। পার্বতী বা পার্বতীর এক সখি, অন্য অর্থে ভাং বা সিদ্ধি। ১০। কালীর প্রতীকী ফুল। ১১। চোখের পরিচয়ে দুর্গা ১২। প্রদীপাদি দিয়ে দেবীর বরণ, এই সময় ধুনুচিনাচও হয়।

সমাধান শব্দজব্দ ১

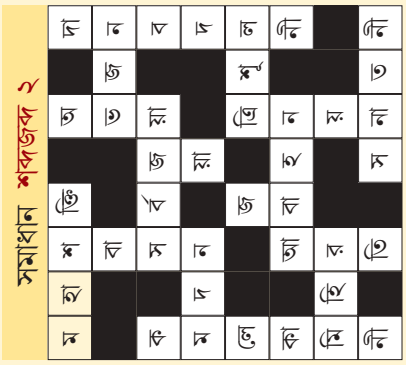

সম্পাদকীয়

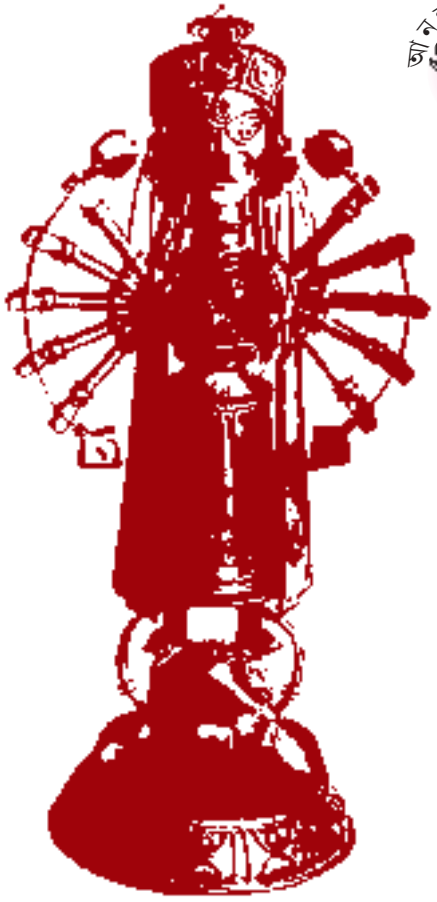

আনন্দ উৎসব

পুজো এসে গেছে। পুজো মানে আনন্দ, খুশি, খাওয়া-দাওয়া, গান-সিনেমা, সাজ, নতুন জিনিস, দেওয়া নেওয়া, চাওয়া-পাওয়া। এই উৎসবের মরসুমে সব ভুলে আনন্দে গা ভাসানোর প্রবণতা দেখা দেয় আমাদের মধ্যে। ভুলে যাই আমরা ছোট ছোট কতগুলো জিনিস। প্রথমত, খাওয়া-দাওয়ার সময় কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে ভুলবেন না।

দ্বিতীয়ত মজা, মস্তি সবই ভাল, কিন্তু মনে রাখতে হবে পুজোর মধ্যেও কারও বাড়িতে অসুস্থতা, দুঃখ, শোকের ছায়া নামতে পারে। সেক্ষেত্রে আনন্দের মধ্যেও অন্যের সেন্টিমেন্টকে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। পুজোর আনন্দে মাতোয়ারা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশির কথা মনে রাখবেন।

জ্ঞান দেওয়ার মতো শোনাচ্ছে তো? না জ্ঞান নয়, শুধু একটু সতর্কতা। পুজোর আনন্দ মাটি করে নয়, পুজোর আনন্দ বাড়ানোর জন্যই অন্যের কথা মাথায় রাখা দরকার।

এবার পুজোয় সেলিব্রিটিরা কী করবেন তার ফিরিস্তি যেমন রয়েছে সুবিধায়, তেমনই নিজে হাতে কলম ধরেছেন ফেলুদা ও ব্যোমকেশ সুবিধার জন্য। সব্যসাচী চক্রবর্তী ও আবীর চট্টোপাধ্যায়। দু'জনেই তাঁদের বেড়ানোর অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন আমাদের পাঠকদের সঙ্গে।

শ্রাবন্তী, ছোটবেলা থেকে অভিনয় শুরু করে। মাঝে সব ছেড়ে ছুড়ে সংসারে মন দিয়েছিল। কিন্তু পাঁচ বছর পর আবার ফিরে এলো ছবির জগতে। এবং এখন শ্রাবন্তী হিট হিরোইন। বিয়ের পরও কীভাবে নিজের কেরিয়ার গড়া সম্ভব, তাও আবার গ্ল্যামার জগতে তা জানিয়েছে শ্রাবন্তী।

এছাড়াও সুবিধা-তে এবার দেওয়া হয়েছে দু'টি গল্প, পুজো উপলক্ষে। গল্প দুটো আলাদা রসের। আশা করি পাঠকরা উপভোগ করবেন।

আমাদের ফ্যাশন পাতায় এবার রয়েছে চার নায়িকার সাজগোজ। পছন্দ হলে জানাবেন। আমরা কিন্তু পাঠকদের প্রতিক্রিয়া জানতে ইচ্ছুক। তাই তাঁদের চিঠির অপেক্ষায় থাকি।

পুজো আনন্দে কাটান, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে, এই আশা নিয়েই আজ ইতি টানছি।

সুদেষ্ণা রায়, সম্পাদক

চিঠি চাই চাই মতামত

চিঠি লিখুন, জিতুন ১০০০ টাকা

'সুবিধা'-র তৃতীয় সংখ্যা এটি। এই পত্রিকার সঙ্গে অনেকেরই এখন পরিচয় হয়ে গেছে, তাই বলছি কী বন্ধু চাই আপনাদের সহযোগিতা, পত্রিকাটিকে আরও সুন্দর করে তুলতে। চিঠি লিখে বা ই-মেল করে জানান এই পত্রিকার কী ভাল কী খারাপ! যাঁদের চিঠি আমরা আমাদের এই পত্রিকায় ছাপাব তাঁদের দেওয়া হবে **হাজার টাকা উপহার**! এ ছাড়া প্রথম ১০০টি চিঠির প্রেরককে দেওয়া হবে ৫০০টাকা করে পুরস্কার। চিঠির সঙ্গে আমাদের দেওয়া কুপনটি ভরে পাঠাবেন। ধন্যবাদ

আমাদের ঠিকানা
সম্পাদক, সুবিধা
প্রযত্নে : এসক্যাগ ফার্মা প্রাঃ লি,
পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক বি
কলকাতা : ৭০০০৮৯
email : eskagpha@vsnl.com

নাম .... বয়স..................

ঠিকানা ....

কী করেন ....

শিশুর প্রতিরক্ষায় প্রো বায়োটিক

প্রতিবছর বহু শিশুর প্রাণ নেয় রোটা ভাইরাস জনিত ডায়রিয়া। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই সমস্যা মাত্রাতিরিক্ত প্রকট হলেও উন্নত দেশগুলোও এক্ষেত্রে খুব একটা পিছিয়ে নেই। যদিও এই সমস্যা সমাধানে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি প্রোবায়োটিকেরও ভূমিকা স্বীকার করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের দাবি, রোটাভাইরাস ডায়রিয়া প্রতেরাধে প্রোবায়োটিক খুব ভাল কাজ দেয়। তাই স্বভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, রোটাভাইরাল ডায়রিয়া কী? এর লক্ষণ কী? আর প্রো-বায়োটিক ব্যবহারের সঙ্গে এর সম্পর্কই বা কী? উত্তর দিচ্ছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ সৌগত আচার্য

রোটা ভাইরাস আসলে কী

রোটা ভাইরাস হল এমন এক ধরনের জীবানু যার সংক্রমণে শিশু এবং একটু বেশি বয়সীরা মাঝে মধ্যেই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হন। ল্যাটিন ভাষায় 'রোটা' শব্দের অর্থ চাকা। এই ভাইরাস চাকার মতো দেখতে বলেই এর এমন নাম। নামের গুণ বজায় রেখে মাঝে মধ্যেই ঘুরে ফিরে আক্রমণ করে এই জীবানু।

প্রায় প্রতিটা মানুষকেই শৈশবে কখনও না কখনও এই জীবানু সংক্রমণের কবলে পড়তে হয়। আবার একটু বড় হলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মালে তখন এর থেকে অনেকটা নিরাপদ দূরত্বে থাকা যায়।

রোটা ভাইরাল ডায়রিয়ার লক্ষণ কী

অনেক সময়ই রোটা ভাইরাস সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে কোনও রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। দু-চারদিন ভাইরাস শরীরের ভেতরে বাসা বাঁধে এবং শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। তবে কখনও কখনও রোটা ভাইরাস সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই নানা উপসর্গ দেখা দেয়। সাধারণত এই ডায়রিয়ার লক্ষণ হল, বারবার জলের মতো পায়খানা, বমি। সঙ্গে জ্বর এবং পেটে ব্যথা, শীতকালে এবং ঋতু পরিবর্তনের সময়ে এর বাড়বাড়ন্ত হলেও এ রোগ দেখা দিতে পারে যে কোনও সময়েই।

এই ডায়রিয়া কখন বিপদজনক বলে ধরতে হবে

যদি দেখা যায় রোগীর ডিহাইড্রেশন দেখা দিয়েছে অর্থাৎ শরীরে সাংঘাতিক রকম জলের ঘাটতি হয়েছে তখনই তা বিপজ্জনক। জলের যে ঘাটতি হয়েছে তা বোঝা যায় যখন দেখা যায় রোগীর প্রচণ্ড তেষ্টা পাচ্ছে। রোগী ঝিমিয়ে পড়ছে, ত্বক শুষ্ক, রুক্ষ ও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, কান্নার সময়ও চোখ থেকে জল পড়ছে না, তখন বুঝতে হবে শরীরে ডিহাইড্রেশন দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় শরীরে জলের যোগান দেওয়া, ওআরএস হাতের কাছে না পেলে, জলে এক চিমটে নুন আর চিনি মিশিয়ে তাই খাওয়াতে হবে। তবে তাতেও তেমন উন্নতি না হলে হাসপাতালে ভর্তি করে স্যালাইন দিতে হতে পারে।

রোগ কীভাবে ছড়ায়

রোটা ভাইরাস সংক্রমক জীবানু। শরীরে ঢোকার মূল পথ হল হাত-মুখ। আঢাকা খাবার, ফ্রিজে রাখা বহুদিনের খাবার থেকে যেমন এই সংক্রমণ হতে পারে তেমনই আক্রান্ত ব্যক্তি টয়লেটে যাওয়ার পর, ভাল করে না ধোয়া হাত যদি কোথাও রাখে সেই জায়গা থেকেও রোগটা ছড়াতে

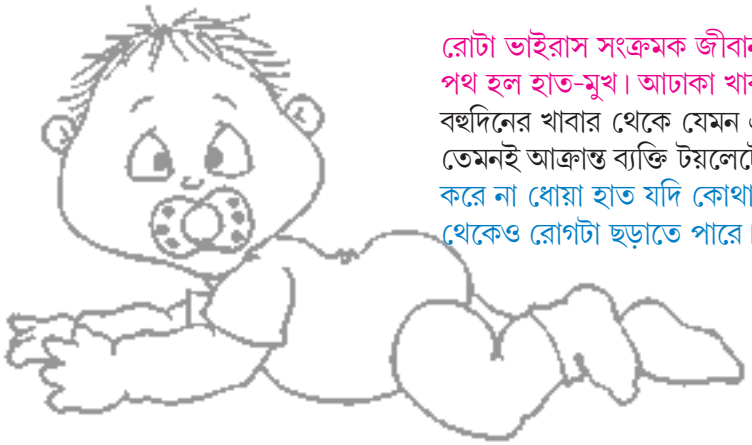

রোটা ভাইরাস সংক্রমক জীবানু। শরীরে ঢোকার মূল পথ হল হাত-মুখ। আঢাকা খাবার, ফ্রিজে রাখা বহুদিনের খাবার থেকে যেমন এই সংক্রমণ হতে পারে তেমনই আক্রান্ত ব্যক্তি টয়লেটে যাওয়ার পর, ভাল করে না ধোয়া হাত যদি কোথাও রাখে সেই জায়গা থেকেও রোগটা ছড়াতে পারে।

পারে। তাই প্রতিবার টয়লেট ব্যবহার করার পর এবং খাওয়ার আগে ভাল করে সাবান জল দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া অভ্যাস করা খুব জরুরি।

এর চিকিৎসা কী

রোটা ভাইরাস সংক্রমণ সাধারণত সেলফ লিমিটেড ডিজিজ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের পর এর প্রভাবে হওয়া ডায়রিয়া আপনা আপনিই কমে যায়। এর জন্য প্রয়োজন হয় না কোনও ওষুধ-বিষুধের। তবে প্রথম থেকেই বেশি করে জল রোগীকে খাওয়ানো দরকার যাতে ডিহাইড্রেশন না হয়। তাই ও আর এস বা নুন-চিনির জল খাওয়ানো দরকার প্রথম থেকেই।

প্রতিরোধের উপায় কী

বাইরের কাটা ফল, আঢাকা খাবার কিংবা ফ্রিজে রাখা অনেকদিনের বাসি খাবার না খাওয়া। এই রোগ অনেকাংশেই প্রতিরোধ করা যায় যদি টয়লেট ব্যবহার করার পর হাত সাবান দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করা যায় এবং প্রতিবার খাওয়ার আগে হাত ধুয়ে নেওয়া যায়। এখন অবশ্য প্রোবায়োটিক এই রোগ-প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

প্রোবায়োটিক আসলে কী

আমাদের ইনটেস্টিনাল ওয়ালে অর্থাৎ অন্ত্রের বেশ কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকে যেগুলো শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে, শুধু ভাইরাস নয়, যে কোনও ধরনের জীবাণুর বিরুদ্ধে জোরদার কাজ করে এই জীবানু। আর প্রোবায়োটিক সাহায্য করে এই উপকারি ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়াতে। ফলে প্রোবায়োটিকের সাহায্যে শুধু ডায়রিয়া বা বমি নয়, আরও অনেক পেটের অসুখ থেকে দূরে থাকা যায়। সর্বোপরি সঠিক মাত্রায় এর ব্যবহারের ফলে বিশেষ বিশেষ অসুখ যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক দিতেই হয়, সেখানেও অনেক সুরাহা হয়।

কাজেই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রোবায়োটিকের বিরাট অবদান রয়েছে। পাওয়া যায় দই, ইয়োগার্ট কিংবা ট্যাবলেটের আকারে।

কখন দিতে হয় প্রোবায়োটিক

রোটাভাইরাল ডায়রিয়ার প্রাথমিক লক্ষণ দেখেই দেওয়া যেতে পারে। তাহলে রোগীর কষ্ট বা জটিলতা তেমন বাড়তে পায় না। কারণ প্রোবায়োটিক বাইরের ভাইরাসগুলোকে নষ্ট করে দেয়। তাছাড়া যাঁদের শীতকাল বা ঋতু পরিবর্তনের সময় ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাঁরা ওই সময়ে কিছুদিন প্রোবায়োটিক ব্যবহার করলে রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়।

অসুস্থ বা আক্রান্ত না হলেও কি প্রোবায়োটিক ব্যবহার করা যায়?

রোগ প্রতিরোধের জন্য করা যেতেই পারে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রোবায়োটিক ব্যবহার করলে, রোগ পুরোপুরি প্রতিরোধ করা না গেলেও জটিলতা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে
ডা. সৌগত আচার্য
email : saugata69@hotmail.com
ফোন ৯৮৩০০৬৮৫৬৭

হারিয়ে পাওয়া

অনুপ ঘোষাল

রাত তিনেটেয় প্লেনটার দমদমে নামার কথা। অর্থাৎ রাত্তির জেগে বসে থাকার হ্যাপা—এই এক গেরো! বোয়িংটা আমস্টার্ডাম থেকে সরাসরি উড়ে এসে দিল্লিতে ল্যান্ড করে রাত সাড়ে এগারোটায়। তারপর সেখানে স্থানীয় প্যাসেঞ্জার নামিয়ে ঘণ্টাখানেকের চেক-আপ ও জিরিয়ে নেওয়ার পালা। অতঃপর উড়ে এসে কলকাতায় ফ্লাইট টার্মিনাল। কে এল এম-এর এই যাত্রার শুরু নিউইয়র্ক থেকে। প্লেন পাল্টাতে হয় না, এই যা সুবিধে।

শমীক বেলঘরিয়া থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে রাত একটা নাগাদ ঢুকে পড়েছে নেতাজি সুভাষ এয়ারপোর্টের ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালে। এনকোয়ারিতে জেনে নিয়েছে, ফ্লাইট লেট। রাত একটা বারো, এখনও প্লেনটা দিল্লিই পৌঁছয়নি। ভাল-ই হয়েছে। রাত তিনটেয় ট্যাক্সি পাওয়া ঝামেলা। ড্রাইভাররা দুনো দর হাঁকে। সূর্যের আলো ফুটলে ট্যাক্সিওয়ালাদের দাপট কমে।

কাউন্টার থেকে এন্ট্রি-পাস কিনে শমীক পেল্লাই ইলেকট্রনিক ঘড়িটার সামনে একটা চেয়ার ফাঁকা পেয়ে বসে পড়ল। এখন হাত পা ছড়িয়ে আধোঘুমে রাতটুকু কাবার করতে হবে। চোখ খুললেই লাল সংখ্যায় জ্বলছে সময়। আর বুকের ভিতর এক অদ্ভুত শৈত্য। কখনও অসহ্য।

চোখদুটো তবুও বুজে থাকার চেষ্টা করছে আপ্রাণ। পারছে না। বিশাল লাউঞ্জ। কতধরনের মানুষ যে বসে আছে চারিদিকে। কেউ ভোররাতের ফ্লাইট ধরবে। কেউ-বা এসেছে কাউকে রিসিভ করতে। বাঙালি-অবাঙালি। দেশি-বিদেশি। গ্লোবাল ভিলেজ বলে একটা কথা উঠছে না ইদানীং। এখানে এলে সেটা বিশ্বাস হয়।

লন্ডন থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা উড়ান এসে পৌঁছেছিল কিছুক্ষণ আগে। যাত্রীরা বেরিয়ে যাচ্ছে লটবহর ঠেলতে ঠেলতে। কতজনকেই তো মনে হল বাঙালি। বিলেতে এত বাঙালি থাকে? সকলে এক ফ্লাইটেই ফিরল নাকি! সকলের পিছনে দু'জন এয়ারহোস্টেস এবং এক পাইলট হাসি ঠাট্টা করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছে একসঙ্গে। দৃপ্ত হাঁটার ভঙ্গি তাদের, সবার চেয়ে আলাদা। খুশিতে হাসিতে উচ্ছ্বসিত। এমন লম্বা ফ্লাই করার পর মাঝরাতেও বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই চোখেমুখে। এখনও তরতাজা, টগবগ করে ফুটছে যেন! পরের ফ্লাইটে চাপিয়ে দিলেই ঠিক উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে আর একটা প্লেন। এমন অফুরান প্রাণশক্তি এরা পায় কোত্থেকে? শমীক এই মধ্য পঞ্চাশেই কেমন ধুঁকছে। আধরাত্তির জেগেই কাহিল। যাকে নিতে এসেছে, তার জন্য বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই দুটো মাস পরেও। কেন? এদের কাছে কি কিছুটা এনার্জি কর্জ করা যায়? ছুটে যাবে নাকি!

হঠাৎ ক্লান্তিটা ঝেড়ে চাঙ্গা হয়ে উঠল শমীক। বুকের ভিতরটা কেমন শিরশির করে উঠল। ওর ডানদিকে খানিক দূরে চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দেওয়া মেয়েটা কে? এই মুখ তো তার চিনতে ভুল হওয়ার নয়। ক'বছর হল যেন? বিয়োগ করে চমকে ওঠে নিজেই। চৌত্রিশ!কোন জাদুমন্ত্রবলে সেই মুখখানাই আজ এতকাল পরে তার চোখের সামনে হাজির! সেই রঙ, সেই ছবির মতো আঁকা চোখ নাক। তেমনই বাদামি একঢাল চুল। ওই তো তাকাল। অবিকল সেই ডাগর চোখে সময় ফুঁড়ে সুদূরে চেয়ে থাকার ভঙ্গি। শরীরটা বদলে গেছে। তা যাক! মনও কি বদলায়?

এতদিন পরে কোনও মেয়ের মুখ মানুষের ঠিকঠাক মনে থাকে? মনের মধ্যে তেমনভাবে গাঁথা থাকলে উবে যাবে কোথায়?

শমীক তখন বি এস সি-র ফাইনাল ইয়ার। কে এন কলেজে

কেমিস্ট্রি অনার্স। বহরমপুরের রানিবাগানে তাদের ভাড়াটে বাসার জাস্ট পাশের বাড়ির মেয়ে। বয়সই বা কত তখন, তেরো-চোদ্দ হবে বোধহয়। সবে ক্লাস এইট। দারুণ দেখতে। তখনই তাকানো যেত না, যেন বিদ্যুৎ। প্রথম ক'দিন চোখটা ঝলসে গেলেও পরে সামলে নিয়েছিল শমীক।

দারুণ কেটেছিল ক'টা মাস। মেধাবী ছাত্র হিসেবে পাড়ায় শমীকের নাম ছিল। মেয়েটির মা কাকুতি মিনতি করে ওকে একটু পড়াশোনা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য রাজি করিয়েছিলেন। শুধু দুটো সাবজেক্ট—অঙ্ক আর ফিজিকাল সায়েন্স। রণিতার বাবা ছিলেন না। স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর বনানী কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে, একই স্কুলে কেরানির চাকরি পেয়েছিলেন। অভাবের সংসার, অসহায় পরিবার।

নিছক অনুকম্পাবশত ফুটফুটে মেয়েটিকে দাতব্য টিউশনের অবসরে সদ্য-যুবক শমীকের কখন যেন ভাল লাগতে শুরু করেছিল! কিন্তু সে চেপে গিয়েছিল। নিজের সুনামের প্রতি সুবিচারের দায় ছিল। দুঃসাহস দেখানোর স্পর্ধা কোথায়! বরং বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল সেই কিশোরীটিই। কেমন করে, কে জানে!

যৌবনের টাটকা ছোঁয়া-লাগা মেয়েটির চোখের ভাষায় এমন এক আন্তরিক আমন্ত্রণ ছিল, কোনও বিষয় বোঝাতে বোঝাতে ওর মুখখানায় নজর তুললেই শমীকের বুকের ভিতরটা কেমন আনচান করে উঠত। মেয়েটি প্রথমে মুখ ফুটে কিছু বলেনি। শুধু শমীকেরা যখন গোরাবাজারে নতুন বাড়ি করে উঠে গেল, শেষদিনে কিশোরীটি ওর কুয়োর মতো গভীর দুই কালো চোখ তুলে স্পষ্ট উচ্চারণে জানিয়েছিল আপনি বড্ড ভিতু শমীকদা। সামনের বছরই তো গ্রাজুয়েশন হয়ে যাচ্ছে, বড় হয়েও এমন? যেটা ভাবেন, বলতে পারেন না? ভিতুর ডিম একটা।

শমীক অবাক হওয়ার ভান করেছিল—ভিতু মানে?

—আমাকে বলার জন্য আপনার কি কোনও কথা নেই? বুকে হাত রেখে বলুন। কিছু ইচ্ছে করে না?

থতমত খেয়েছিল শমীক—ইচ্ছে মানে? সে তো কতকিছুই থাকে মনের মধ্যে, কিন্তু...তুমি বলছ কী রনি?

মেয়েটি মাথা নিচু করে বলেছিল—আমি রাজি। কিচ্ছু কেয়ার করি না। পারবেন? একটু সাহস দেখান না, প্লিজ। মেয়েটির স্বর কেমন গাঢ় হয়ে উঠেছিল। চোখদুটো জলে ভেজা।

কী বলবে তখন শমীক! কী বলার ক্ষমতা সেদিন ছিল তার? এড়িয়ে গিয়েছিল। দারুণ ভয় পেয়েছিল।

অনার্স পাস করে ঈশ্বরচন্দ্র ইনস্টিট্যুশনে যখন শমীক শিক্ষকতার চাকরি পেল, তখন রানি বাগানে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে রণিতার বিয়ে হয়ে গেছে। সবে মাত্র ক্লাস নাইনে উঠে, পনেরো বছর বয়সেই। বেআইনি ব্যাপার। তখনকার দিনে এসব নিয়ে মফস্বলে কে আর মাথা ঘামাত! আর এমন সুন্দরীদের জন্য বোধহয় সব কানুন শিকেয়।

কোচবিহারের এক নামি ব্যবসায়ী তাঁর একমাত্র ছেলের বউ

করে রণিতাকে নিয়ে গেছে সেখানে। ছেলেটি তখন চড়া ক্যাপিটেশন ফি গুনে বেঙ্গালুরুর এক বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। সুন্দরী পাত্রী ছাড়া কোনও দাবি ছিল না সেই আড়তদার শ্বশুরের। বিধবা বনানী নর্থবেঙ্গলে চাকরিরত তাঁর এক ভাই-এর মাধ্যমে স্বজাতির এই সম্বন্ধটা পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিলেন।

পরিবারের একমাত্র সন্তান শমীকেরও চাকরি জুটে যাওয়ার সুবাদে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তারপর। বহরমপুরেরই মেয়ে অনুরাধা। বনেদি পরিবার। আজ শমীকের এক মেয়ে। তারও বিয়ে গেছে মাত্র একুশেই। দেখতে এবং লেখাপড়ায় সে চমৎকার। চট করে পাত্র পেতে অসুবিধে হয়নি।

এখন ওদের স্বামী স্ত্রীর ঝাড়াঝাপ্টা সংসার। মেয়ে পর্ণা ইদানীং বরের সঙ্গে প্রবাসী। জামাই রোহন টেনেসি ইউনিভার্সিটিতে গবেষক। মেমফিসে থাকে ওঁরা। মেয়েও সেখানে চাকরি করে। ভাল আছে সকলেই।

শমীক পায়ে পায়ে উঠে গেল রণিতার কাছে। মেয়েটি ফের চোখ বুজে ফেলেছে কখন। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি! পাশের খালি চেয়ারটায় শমীক নিঃশব্দে বসল। আবার দেখল দু'দণ্ড। নিশ্চিন্ত হল। তারপর প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় ডাকল—রণি, অ্যাই। অ্যাই রণিতা।

চমকে উঠল ও। চোখ খুলে পাশে ঘাড় ঘুরিয়ে থ। স্বপ্ন দেখছে না তো? একটু সময় নিল ধাতস্থ হতে। রণিতার মুখ ফুটে বেরিয়ে এল —তুমি?

হাসল শমীক—তখন কিন্তু আপনি বলতে!

—দ্যুৎ!

—চিনতে পারলে এত বছর পর?

—বলছ কী? চুলে একটু পাক ধরলে আর খানিক মোটা হলে কি মুখখানাও বদলে যায়? সেই চোখ, নাক, আর থুতনির পাশে এই তিলটা? কোথায় যাবে শমীকদা? একা?

—কোথাও নয়। জাস্ট গিন্নিকে রিসিভ করতে এসেছি। মেয়ের বাচ্চা হয়েছে। নাতি। ও স্টেটসে গিয়ে মাস দু'য়েক থেকে এল। পর্ণা, মানে আমাদের মেয়েও তো ওখানে স্কুলে পড়ায়। একটু বড় না হলে বাচ্চাটাকে ক্রেশেও দিতে চাইছিল না। আর তো ওদের কেউ নেই সেখানে। তাই পাশে গিয়ে একটু দাঁড়ানো আর কি! দেখ রণি, আমরা কেমন জলদি দাদু দিদিমা বনে গেছি। তুমি?

রণিতার মুখখানা হঠাৎ কালো হয়ে এল। গভীর চোখদুটোয় দুফোঁটা জল যেন টলটল করছে। কোনওরকমে মাথা ঝাঁকিয়ে সামলে নিয়ে বিড়বিড় করল স্বগতোক্তির মতো—না। মা পর্যন্তই এগোনো হয়নি। ঠাকুমা-দিদিমা দূর অস্ত!

—বর আছে? সিঁথিতে তো সিঁদুর নেই দেখছি।

এবার রণিতার মুখ থেকে মেঘ সরে এক চিলতে জ্যোৎস্নার মতো আলতো হাসি— থাকলে খুশি হও, নাকি না থাকলে?

—আমি স্পষ্ট কথার লোক। অবশ্যই না থাকলে। রাগ করলে? সেদিন আর নেই। অনুরাধাকে ফের আমেরিকা পাঠিয়ে এখানে আমরা দু'জনে চুটিয়ে প্রেম করব। কোনও বাধা মানব না। আর দেখব, তোমার এখনও সেদিনের মতো বুকের পাটা আছে কিনা!

—ইস বেচারা! আসল খবরটা দিই? বর কানাডা থেকে আসছে। নিউইয়র্ক হয়ে এই ফ্লাইটেই। আমিও রিসিভ করতে এসেছি। সল্টলেক-এ নতুন ফ্ল্যাট। এসো একদিন। ভুলো না।

—এখন এখানে? কোচবিহারে ছিলে না?

—শাশুড়ির সঙ্গে বনেনি। পাট গুটিয়ে চলে এসেছি। বরের বিচ্ছিরি চাকরি। আজ জাপান তো কাল জার্মানি। টেকনোওয়ার্ল্ড-

লাউডস্পিকারে কী একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েই চলেছে। ওরা ঘোষণায় মন দিতে পারেনি। রসিকতায় আর স্মৃতিচারণে এমন মশগুল ছিল, জোরালো শব্দগুলো কানে ঢুকবার সুযোগই পায়নি এতক্ষণ।

এর আউটসোর্সিং একসিকুটিভ। আমি সঙ্গে যাই কখনও। এবার জাস্ট বারোদিনের কাজ ছিল। বার্লিন ছুঁয়ে মনট্রিঅল, তারপর নিউইয়র্ক হয়ে ব্যাক। সামান্য কটাদিনের অ্যাসাইনমেন্ট। হেকটিক ট্যুর। যাইনি।

শমীক হাসছে—যাক, এখানেই আজ চারজনের দেখা হয়ে যাচ্ছে তাহলে! তারপর তোমার কর্তার পারমিশন নিয়ে এই এয়ারপোর্ট থেকেই স্ট্রেট প্রাক্তন প্রেমিকাটির হাত ধরে হাওয়া হয়ে যাব। রাজি? দূরে কোথাও। বহু দূর। যেখানে আমাদের কেউ চিনবে না। একেবারে নিরুপদ্রব। সেখানে শুধু অন্তহীন ভালবাসা। শুধু এই দু'জনে।

রণিতা নিখুঁত ভ্রূযুগল কপালে তুলে বলে—আর তোমার বউ?

—গ্ল্যাডলি তোমার বরকে প্রেজেন্ট করে দেব। যেখানে ইচ্ছে চলে যাক। দেখতে অনুরাধাও মন্দ নয় মোটেই। তোমার কত্তাঠাকুরটি বেঁকে বসবেন না নিশ্চয়!

শরীর ভেঙে হাসছে দু'জনে। শমীক মুখখানা সহসা সিরিয়াস করে বলে—তোমার সাহস তো বরাবরই। মনে আছে। আমিই ছিলাম, কী যেন... ও হ্যাঁ রামভিতু... না না, ভিতুর ডিম। তাই তো? হ্যাঁ, ছিলাম। মানছি। সেটা সুদূর অতীত। এখন আমি দারুণ সাহসী। এক্ষুনি একটা পক্ষীরাজ পেলে তোমাকে নিয়ে উড়ে যেতে পারি। বিশ্বাস হচ্ছে না?

রণিতার মুখটাও কেমন দৃপ্ত হয়ে ওঠে—হচ্ছে। তোমার চোখ দেখেই বুঝছি, এখন তুমি পারবে। খুব কষ্ট হয় জানো, সেদিন পারনি কেন? কেন, কেন?

—সেই অপরাধেই তো আপশোসের বোঝাটা সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তোমার মতো সাহসী মেয়ের বাড়ানো হাত আমি সেদিন একটু এগিয়ে ধরতে পারলাম না, ছিঃ!

রণিতা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে বলে—আজ যে সেটা পার এবং পারবে, সেটা তো জেনে রাখলাম। এটাই আমার বাকি জীবনের পাথেয়। মনে রেখ। ভুলো না যেন! হঠাৎ আজ এভাবে দেখা না হলে...

কথাটা শেষ করতে পারল না রণিতা। কিছুক্ষণের জন্য দু'জনে যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। লাউডস্পিকারে কী একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েই চলেছে। ওরা ঘোষণায় মন দিতে পারেনি। রসিকতায় আর স্মৃতিচারণে এমন মশগুল ছিল, জোরালো শব্দগুলো কানে ঢুকবার সুযোগই পায়নি এতক্ষণ।

যাত্রী এবং অপেক্ষমান সকলের মধ্যে হঠাৎ চাঞ্চল্য, অস্থিরতা। সে কী, কেউ-কেউ কান্নাতেও ভেঙে পড়ছে যে! কেন, কী হল?

দু'জনে এতক্ষণে ঘোষণাটা মন দিয়ে শুনে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল পাশাপাশি চেয়ার থেকে। কে এল এম-এর প্লেনটা ভারতের বায়ুসীমাতে ঢুকবার আগেই ভেঙে পড়েছে আরব সাগরে। যাত্রী বা ক্রু-কেউ বেঁচে নেই।

শমীক আর রণিতা পরস্পরের দিকে অপলক চেয়ে আছে। অসহায়। কোনও কথা নেই।

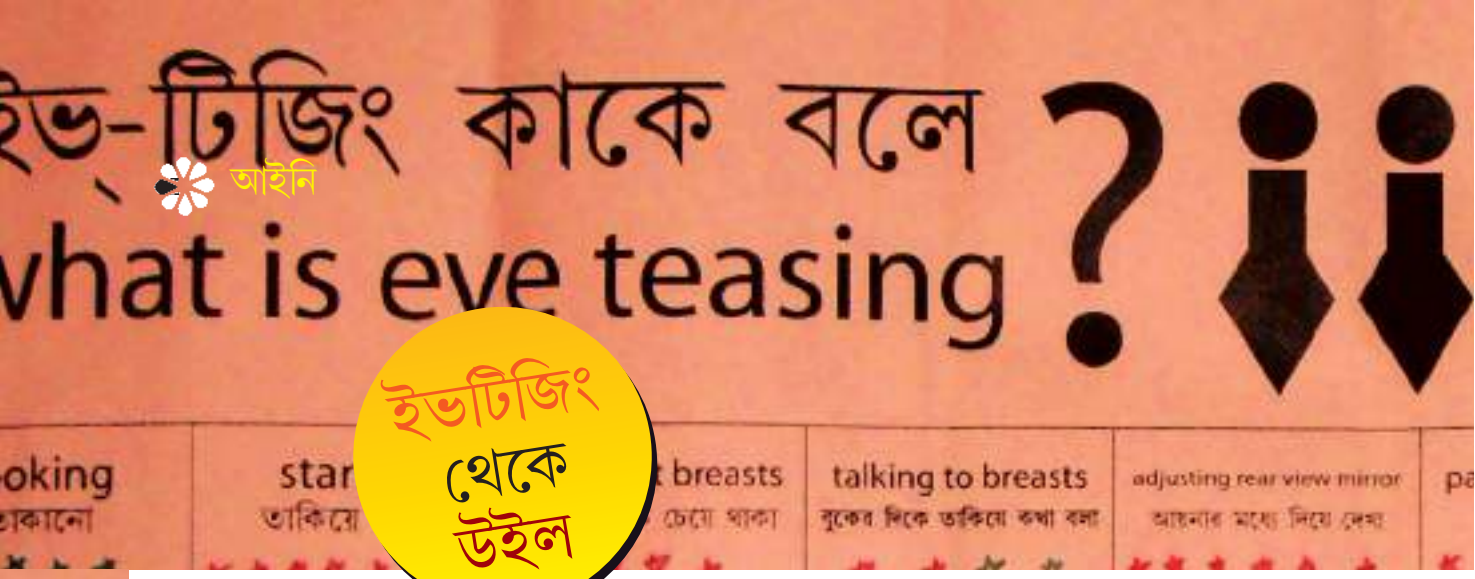

ইভটিজিং থেকে উইল

মা বাবার সঙ্গে স্ত্রীর বনিবনা হচ্ছে না বা স্বামী অন্য কারও প্রতি আসক্ত, কী করবেন ভাবছেন? চিঠি লিখুন আমাদের, পরামর্শ দেবেন বিশিষ্ট আইনজীবী মিতা মুখোপাধ্যায়

পাড়ার দু'তিনটি ছেলে প্রায় আমাকে ইভটিজিং করে। থানায় ডায়েরি করেছি, এর বিচার কীভাবে পাব?
মিতালি দাশগুপ্ত, বাগুইআটি, কলকাতা-৫৯

আইনের চোখে মেয়েদের জ্বালাতন বা বিরক্ত করা, টোন কাটা, অশ্লীল বা কুৎসিত ইঙ্গিত করা ইভ-টিজিং। স্কুল-কলেজের অল্পবয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে এই ঘটনা বেশি ঘটে। এক্ষেত্রে ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানাকে ফোন করে জানাতে হবে। অবশ্যই সাক্ষী থাকা দরকার। যদি এক্ষেত্রে কোনও কাজ না হয় লালবাজারের প্রথম তলায় উইমেন্স প্রিভেন্স সেল-এ সরাসরি জানাতে পারেন এবং এই সেল খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে। কেস অনুযায়ী ইভটিজিং-এর বিচার হয়। তবে ইভ-টিজিং খুন বা ধর্ষণের মতো অপরাধ নয়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে এটা আসে। তাই এটা জামিনযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়।

আমাদের প্রেমের বিয়ে। শ্বশুরবাড়িতে অশান্তি অত্যাচার মানিয়ে নিতে না পারায় দেড় বছরের বাচ্চাকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসি। আগে স্বামী নিয়মিত টাকা পাঠাতেন, এখন তা বন্ধ করে দিয়েছেন, উল্টে ভয় দেখাচ্ছেন। এক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি?
রমা রায়, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪

আপনার স্বামী কি স্বেচ্ছায় টাকা পাঠাতেন? তাহলে কেন বন্ধ করলেন? যাই হোক, এক্ষেত্রে আই পি সি ১২৫ ধারায় ভরণপোষণের মামলা করে আপনি সন্তানের জন্য টাকা পেতে পারেন। কোর্ট টাকার পরিমাণ ঠিক করে দেবে। যদি স্বামীর অত্যাচার থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তির কথা ভাবেন তবে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের কতে পারেন। দু'টি ক্ষেত্রেই এগোনোর জন্য দক্ষ আইনজীবির পরামর্শ নেবেন।

বাবা-মা ও আমাকে নিয়ে আমাদের ছোট পরিবার। সম্প্রতি আমার বিয়ে হওয়ার পর আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাবা-মার বনিবনা হচ্ছে না। কেউ কারও সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারায় বাড়িতে প্রায়ই অশান্তি হয়। বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছেড়ে চলে যেতে চাইছি না। এক্ষেত্রে আমার করনীয় কী?
নিখিল নস্কর, সোনারপুর

আপনি স্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলুন ও বোঝান। মানিয়ে নিতে বলুন। যদি একান্তই সম্ভব না হয় তবে স্ত্রীকে নিয়ে অন্য জায়গায় ঘর ভাড়া করে থাকুন। বাবা-মাকে আলাদা করার কথা ভাববেন না। বৃদ্ধ বাবা-মার প্রতি কর্তব্য করাটা আপনার দায়িত্ব। আপনি বাইরে ভাড়া থাকলেও বাবা-মার খরচ পাঠাবেন। শীর্ষ আদালতের আইন অনুযায়ী বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছেলে বা মেয়ে ভরণ পোষণ দিতে বাধ্য।

আমার যাবতীয় স্থাবর ও অ-স্থাবর সম্পত্তি ছেলে মেয়ের মধ্যে উইল করে দিতে চাই। ১০টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মাধ্যমে। এটা আইনসিদ্ধ হবে কী?
ইন্দিরা দেবী, বেহালা

যে কোনও মানুষ তাঁর সম্পত্তি উইল করতে পারেন। এটা হতে পারে মৌখিক, লিখিত বা চিঠির মাধ্যমে। তবে যেভাবেই হোক সেখানে হাজির থাকতে হবে আইনজীবী ও সাক্ষীদের। প্রত্যেককে স্বাক্ষর হতে হবে। দ্বিতীয়বার উইল করতে হলে প্রথম উইলটি বাতিল করতে হয়। উইল করার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক নয়।

অল্পবয়সে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়। দু'বছরের একটি মেয়ে আছে। আমার স্বামী নামকরা বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করেন। স্বামী অফিসের এক সহকর্মিনীর সঙ্গে প্রণয়ে আবদ্ধ। বিয়ের আগে থেকে তাদের এই সম্পর্ক ছিল। আমি ওঁর ব্যাপারটা মেনে নিতে পারিনি। (যদিও স্বামী আমার প্রতি দায়-দায়িত্ব পালন করে) এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে উত্তর পাইনি বরং সব সময়ে অস্বীকার করেন। আমি এই ব্যবস্থা থেকে মুক্তি চাই ও স্বামী সঙ্গ ত্যাগ করতে চাই।
এ ব্যাপারে পরামর্শ চাই।
বুলবুল বসু, যাদবপুর, কলকাতা- ৩২

সবার আগে এই বিষয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা বলুন। নিজে না পারলে, সঙ্গে তৃতীয় কোনও বন্ধু বা আত্মীয়কে সঙ্গে রাখুন। আপনার অবস্থান তুলে ধরুন। একান্তই সমঝোতার পথে না গেলে কোর্টের মাধ্যমে জুডিশিয়াল সেপারেশন নিয়ে দু'জনে আলাদা জায়গায় থাকতে পারেন। না হলে মিউচুয়াল ডিভোর্স করতে পারেন। সন্তানের খরচের জন্য অবশ্যই ভরণ-পোষণ পাবেন।

আপনাদের কিছু প্রশ্ন থাকলে আমাদের দপ্তরে লিখতে পারেন। খামের উপর আইনি কথাটা লিখতে ভুলবেন না।

সুবিধা (আইনি)
প্রযত্নে : এসক্যাগ ফার্মা প্রা. লি.
পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল
ব্লক-বি, কলকাতা ৭০০০৮৯

কাছে দুরে ১

সমুদ্র পাহাড় ভ্যালিগুহা মোহময় অন্ধ্র !

পুজোয় সপরিবারে ‘ব্যোমকেশ’ থুড়ি আবীর চট্টোপাধ্যায় গিয়েছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশ ঘুরতে, ঠিক পুজোর পর পরই। প্রতিবছরই দশমী বা একাদশীতে বেড়িয়ে পড়েন ওঁরা পুজো শেষের দুঃখ ভুলতে। এবারেও যাবেন। আমাদের জন্য ওঁর উপহার গত বছরের অন্ধ্র ভ্রমণের কিছু সুখকর স্মৃতি।

পুজো ব্যাপারটার সঙ্গে বাঙালির রোম্যান্টিকতা চিরকালীন। আর কতগুলো চিরচেনা ছবি তো আছেই নীল আকাশ, পেঁজা মেঘ, প্রচুর ঘোরাঘুরি, রাত্রি জাগরণ, বাড়ি, প্রেম, আর তার সঙ্গে নতুন পোশাক, ডিসকাউন্ট, পায়ে ফোসকা, নেশা, ভিড়, সব মিলিয়ে আমাদের একান্ত নিজের বার্ষিক সেলিব্রেশন। সে না হয় হল। কিন্তু ওই চারদিন, থুড়ি এখন তো টেনেটুনে স্বচ্ছন্দে সাত-আট দিন, কেটে গেলেই কেমন একটা ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে, না?

ওই সদ্য বিরহী কলকাতাকে দেখতে কেমন মন খারাপ হয়ে যায়। কতকটা সে জন্য, আর অনেকটাই বউ-এর গুঁতো খেয়ে দশমীর রাতেই বাক্স-প্যাঁটরা বেঁধে সপরিবারে কলকাতার বাইরে। এমনই একটা শিডিউল আমাদের। না না অভিযোগ করছি না একদমই, তবে একদম নিজের জন্য সময়টা চুরি হয়ে গেছে কেমন!

সে বারের গন্তব্য ছিল ভাইজ্যাগ। চেন্নাই মেল। রাত পোহালেই ইডলি, ধোসা আর ঝাঁ চকচকে রাস্তা, শহর পেরোলেই রাস্তার একদিকে সবুজ ঘেরা পাহাড়, আর অন্যদিকে সমুদ্র। জলের রঙ কোথাও নীল কোথাও বা হালকা সবুজ। লোভ হয়, দেশের মধ্যেই এমন একটা জায়গা! গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটা আশি-নব্বই-র নিচে নামানোর দরকারই পড়ে না।

আমরা বাঙালিরা তো বেসিকালি ‘দীপুদা’। তা দীঘা-পুরীর সমুদ্রের সঙ্গে এতটাই পরিচিতি যে রুষিকোন্ডায় যখন প্রথম পৌঁছলাম তাক লেগে যাওয়ার জোগাড়। পাহাড়ের ধাপ কেটে বানানো অন্ধ্র ট্যুরিজমের রিসর্ট। ঘরে আরাম-আয়াসের এলাহি ব্যবস্থা। একদিকের দেওয়াল জোড়া কাঁচের জানলার ওপারে যতদুর চোখ যায় পাহাড়ের কোলে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। আর

জল এতটাই স্বচ্ছ যে কোনও পাঁচতারা হোটেলের সুইমিং পুল মনে হলে ভুল নেই। আর এই দুই-এর মাঝখান দিয়ে লম্বা হারিয়ে যাওয়া কালো পিচের সর্পিল, সিক্স লেন মসৃণ হাইওয়ে।

রুষিকোণ্ডা বিচ-এ চান করার লোভ সামলানোর থেকে বড় কৃচ্ছসাধন স্বাভাবিক মানুষের আয়ত্বের বাইরে। তবে বিধিসম্মত সতর্কীকরণ, হাঁটুর জোর আর বুকে দম আবশ্যিক উপকরণ। প্রায় এক থেকে দেড় কিলোমিটার পাহাড় ভেঙে একবার পৌঁছে গেলে আরেকটা মজা অপেক্ষা করে থাকবে। খোদ অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানীতে লাউডস্পিকারে বাংলা। আশেপাশে নব্বই শতাংশ মানুষই তো বাঙালি। একসঙ্গে তিনজন অভিনেতা। (অনেকেই যদিও আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত) দেখে তারাও বেশ উল্লসিত। জয় হোক বাঙালি ভ্রমণপিপাসু মনের। তবে বাঙালির রসনায় একটু অসুবিধা হতেই পারে। রুই মাছের মতো অতি আপন মাছের নামে যে সামুদ্রিক মাছের স্বাদ পেলাম বাবা-মা-আমি, নন্দিনী ও দলের বাকিরা, সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলাম, এরপর থেকে স্থানীয় খাবারেই মনোনিবেশ করতে হবে। রাতের অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের পরিবেশের মজাটা আরও খোলতাই হল। পাহাড় জুড়ে রিসর্টের আলোর চাঁদমালা আর একটানা ঢেউ ভেঙে পড়ার আওয়াজ। অপূর্ব।

দ্বিতীয় দিনের প্ল্যান ভাইজ্যাগ শহরটাকে ঘুরে ফিরে দেখার। সঙ্গে সংলগ্ন ট্যুরিস্ট স্পটগুলোও। তবে সমুদ্র স্নান করে তারপর। শহরটার একটা মারাত্মক ঐতিহাসিক পরম্পরা আছে। পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ভারতীয় নৌবাহিনীর বীরত্বের কথা শহরের বন্দরে, সদ্য অবসর নেওয়া সাবমেরিনে জ্বলজ্বল করছে। তবে একটা কথা নিশ্চিত নৌবাহিনীর চাকরি আমার হত না। ছয় ফুট দুই ইঞ্চির শরীর নিয়ে সাবমেরিনে প্রায় হামাগুড়ি দিতে হচ্ছিল। সমুদ্রের তলায় দিনের পর দিন মানুষগুলো কতটা কষ্ট করে থাকে, প্রতিকুলতম পরিস্থিতিতে, স্রেফ আমাদের সুরক্ষার জন্য, ভাবলে নিজেদের আয়েসি জীবনে একটু লজ্জা লাগতেই পারে।

ডলফিন সামনাসামনি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে ভাইজ্যাগ-এর বন্দর এলাকা পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই পাহাড় যেখানে মিশেছে সাগরে, অবিকল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে দেখা ডলফিন নোজ। আর তার পাশে ইয়ারদা বিচ। বহু বাংলা ছবির গানের দৃশ্যর অবধারিত গন্তব্য। ফেরত পথে আবার চড়াই। এক সমুদ্রতট থেকে আরেকটি যেতে পাহাড়ে ওঠার যুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে প্রচণ্ড প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল দলের সেনাপতি প্রসুন ভট্টাচার্য। তবে সব অভিযোগ ম্লান হয়ে গেল লাইটহাউসের টঙে উঠে। একপাশে ছবির মতো শহর আর অন্যদিকে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। ভাগ্যিস পরিবর্ত ব্যাটারি ছিল সঙ্গে, তাই নির্দ্বিধায় ক্যামেরার শাটার টিপে চললাম।

রেড হিলস। লালচে বালিতে ঘেরা অদ্ভুত নিস্তব্ধ পাহাড়। শেষ নেই, শুধু বালি, আর পাহাড় জোড়ে জোড়ে। রহস্য রোমাঞ্চ গল্প ফাঁদলে এমন জায়গায়ই শ্যুটিং করতে হবে।

এরপর রেড হিলস। লালচে বালিতে ঘেরা অদ্ভুত নিস্তব্ধ পাহাড়। শেষ নেই, শুধু বালি, আর পাহাড় জোড়ে জোড়ে। রহস্য রোমাঞ্চ গল্প ফাঁদলে এমন জায়গায়ই শ্যুটিং করতে হবে। চড়া রোদ উপেক্ষা করে রেড হিলস পেরিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম তাতলা কোন্তার দিকে। দু'হাজার বছর পুরনো বৌদ্ধ মনাস্ট্রি। ভাবলে অবাক লাগে আজ থেকে অত বছর আগে দূর দূরান্ত থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতরা ভিড় করেছিলেন সমুদ্র আর পাহাড় মেশানো এই জায়গায়। তাঁদের থাকার, উপাসনা করার, মায় রান্না করার ঘরে স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। এত বছর ধরে রোদ, জল, ঝড়-ঝাপটার পরেও কেমন অদ্ভুতভাবে বয়ে চলেছে পুরনো দিনের কত না বলা গল্প।

সারা দিনের ক্লান্তি এক নিমেষে ভুলে গেলাম, যখন পৌঁছলাম কৈলাশগিরিতে। সারা শহর, পাহাড়, ইংরেজি U অক্ষরের মত সবজে নীল সমুদ্র একটা লং শটে ধরে রাখা যায় মনের মধ্যে কোথাও।

ভাইজ্যাগ থেকে আরাকু। ভোরবেলায় অনেক কষ্টে বিছানা ছেড়ে আবার ট্রেন। কোট্টাভাসালা থেকে বাঁ দিকে ঘুরতেই শুরু হল একের পর এক প্রায় চুরাশিটা ব্রিজ আর আটান্নটি টানেল। পাহাড়ের গা বেয়ে, আলো-আধাঁরি পথে ভারতের সর্বোচ্চ ব্রডগেজ স্টেশন শিমলিগুডা পেরিয়ে দুপুরের আগেই পৌঁছে গেলাম আরাকু উপত্যকা। ছবির মতো শহর, হাল্কা শীত, হাল্কা রোদ, পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকা মেঘ। আর সব থেকে আকর্ষণীয় বিষয় মোবাইলে টাওয়ার না পাওয়া। কেউ বিরক্ত করবে না। আপনি নিরিবিলিতে পাহাড়ের কোলে, সবুজ ঘেরা, ছোট্ট উপত্যকা শহরে ঘুরে বেড়ান। নিজের কাজের জগতে, দৈনন্দিন পাপক্ষয়ের জন্য অনেকটা এনার্জি স্টক করে নেওয়া। রাত হলেই শিরশিরানি উত্তুরে হাওয়া আর স্থানীয় আদিবাসী মহিলাদের নাচ। ক্যাম্পফায়ার, মাদলের একঘেয়ে অথচ মাদক সুর এক লহমায় ভুলিয়ে দেয় সভ্যতার যাবতীয় খল ব্যস্ততা, প্রতিযোগিতা, ক্লান্তি আর শূন্যতা।

সফরের শেষে একটা চমক। ঠিক যেন ছবির ক্লাইম্যাক্স। সড়কপথে আরাকু থেকে ভাইজ্যাগ ফেরার পথে বোরা কেভ বা স্থানীয় ভাষায় বোরা গুহালু। পাহাড়ের গায়ে প্রায় ৮০০ থেকে ১৩০০ মিটার গভীর গুহা। অন্ধকারে হাতড়ে চলা, রহস্য, পুরনো ঐতিহাসিক গল্প, বাদুড়, সব মিলিয়ে মনে হয় এসে পড়েছি স্পিলপার্গের কোনও রোমাঞ্চকর ছবির সেটে।

ট্রাইবাল রূপকথায় কথিত আছে, বহু বছর আগে আচমকাই আবিষ্কার হয়েছিল এই গুহা আর সঙ্গে শিবলিঙ্গ, তার সঙ্গে চুনাপাথরে অবশিষ্টাংশের চোখ ধাঁধানো আধা-ভৌতিক কারুকার্য।

ফিরতি পথে খানিকটা মন খারাপ, অনেক জমানো ভাল লাগা, একরাশ এনার্জি—আর ডিভি ক্যাম ভর্তি ছবি। কলকাতা শহর এতটাই কাছের ফিরতে কখনওই ক্লান্তি লাগে না। তবে ভাইজ্যাগ-আরাকু-রুষিকোণ্ডা-র টাটকা স্মৃতি কোথাও যেন মনে মনে প্রস্তুতি শুরু করে দিল পরের বছরের বেড়ানোর জন্য। বন ভয়েজ মনে মনে।

এফ বি ডি স্তনের সমস্যা সমাধানে পিল এর ভূমিকা

ফাইব্রোসিস্টিক ডিজিজ অফ ব্রেস্ট সংক্ষেপে এফ বি ডি। নামটা শুনতে যতই খটোমটো হোক না কেন, এটা আদৌ অসুখ কিনা তা নিয়েই অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে এই অতি সাধারণ সমস্যাও মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। তাই এ ব্যাপারে সচেতনতার দরকার আছে। কিন্তু অহেতুক ভয় বা আতঙ্ক থাকা কাম্য নয়। নিজের শরীরের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখলেই এফ বি ডি নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় না। স্তনের এই সমস্যা সম্পর্কে বিশদে জানালেন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ইলোরাশ্রী চক্রবর্তী

এফ বি ডি কী

ফাইব্রো সিস্টিক ডিজিজ বা এফ বি ডি স্তনের এক ধরনের সমস্যা। এতে স্তন ভারী হয়, ব্যথা হয়, পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগে এই ব্যথা ও ভারী ভাব বেড়ে যায়। স্তনে হাত দিলে ছোট ছোট লাম্প বা দলা অনুভব করা যায়। অনেক সময় এই লাম্পগুলো পুরো স্তন জুড়েই থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই লাম্প বিনাইন বা নন-ক্যান্সারস। অর্থাৎ এর সঙ্গে ক্যান্সারের কোনও সম্পর্ক থাকে না। ২০-৫০ বছরের মহিলাদের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়।

কেন হয়

এফ বি ডি-র সঠিক কারণ কিছু জানা যায়নি। তবে দেখা গিয়েছে এই সমস্যা তাঁদেরই বেশি হয় যাঁরা খেতে ভালবাসেন এবং বাছবিচার না করে সবরকম খাবার খেয়ে শরীর মোটা করে ফেলেন।

- খুব দুঃশ্চিন্তা করেন এবং অকারণ টেনশন করেন
- অতিরিক্ত চা, কফি, চকোলেট এবং সোডা খান
- শরীরে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরনের ভারসাম্য না থাকলে অথবা প্রোজেস্টেরন হরমোন কম থাকলে এবং প্রোল্যাকটিন

হরমোন বাড়লেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

লক্ষণ কী

- স্তন ভারী লাগা ও ব্যথা হওয়া।
- এই ব্যথা সারা মাস ধরে হতে পারে। আবার পিরিয়ডের ৫-৬ দিন আগে থেকেও হতে পারে। মাসিক শুরু হওয়ার পর থেকেই ব্যথা আবার কমতে শুরু করে।
- স্তনে হাত দিলে দলা বা লাম্প হাতে লাগে।
- দুই দিকের স্তনেই এই লাম্প হতে পারে।

কী কী পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন

এফ বি ডি-র সমস্যা নিয়ে কেউ এলে প্রথমে তাঁকে যে প্রশ্ন করা হয় তা হল :

- কতদিন হল সমস্যা শুরু হয়েছে?
- পরিবারে মা, দিদিমা, মাসি বা বোন কারও স্তনের সমস্যা আছে কী না।
- অতীতে স্তনের কোনও অসুখ হয়েছিল কী না। হলে তখন কোনও অপারেশন বা বায়োপসি করা হয়েছিল কি?
- যে দলা বা লাম্প স্তনে অনুভব করছেন, তা নরম, শক্ত নাকি দানা দানা।
- সমস্ত স্তন জুড়েই আছে নাকি একদিকে?
- ওই লাম্পগুলো ক্রমশ বড় হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে কী না
- নিপল বা বৃন্ত থেকে কোনও রকম রস বা দুধ বেরোচ্ছে কী না
- নিয়মিত কোনও ওষুধ খেতে হয় কী না।

এইসব প্রশ্নের উত্তর জানার পর প্রথমে চিকিৎসক চেষ্টা করেন, রোগীর মন থেকে ক্যান্সারের আশঙ্কা দূর করতে। তারপর প্রয়োজনে কোনও কোনও রোগীর ক্ষেত্রে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, ম্যামোগ্রাফি, সোনো ম্যামোগ্রাফি, এফ এন এসি, বায়োপসি ইত্যাদি পরীক্ষা করতে হয়। এই সব পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় লাম্পগুলো আদৌ ক্যান্সার কী না।

এফ বি ডি পরবর্তীকালে ক্যান্সারে পরিণত হতে পারে কি

ব্রেস্ট ক্যান্সারের বাড়বৃদ্ধির কারণে স্তনে যে কোনও লাম্প দেখলেই বেশিরভাগ মহিলা ভয় পেয়ে যান। মনে মনে এটাকে ক্যান্সার ধরে নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। চিন্তা হয়, পরবর্তীকালে ওই লাম্প ক্যান্সারের রূপ নেবে না তো! মনে রাখবেন, শতকরা ৭০ ভাগ ক্ষেত্রে এই লাম্প-এর সঙ্গে ক্যান্সারের কোনও সম্পর্ক থাকে না। বায়োপসি করে যাঁদের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কোষের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁদের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি। যদিও মনে রাখতে হবে এই অস্বাভাবিক কোষের দেখা মেলে মাত্র চার শতাংশ ক্ষেত্রে। অধিকাংশ মহিলারই বায়োপসি রিপোর্টে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় না। তবে স্তনে কোনওরকম অস্বাভাবিকতা দেখলেই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যাবশ্যক।

চিকিৎসা কী

এফ বি ডি চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ হল, মহিলাদের মন থেকে ক্যান্সারের আতঙ্ক দূর করা। এটা যে ক্যান্সার নয় এবং ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা নেই তা বোঝানো। তবে কষ্টের উপশমের জন্য কিছু কিছু উপায় মেনে চলতে পরামর্শ দেওয়া হয়। যেমন,

- ফ্যাট বা চর্বি জাতীয় খাবার কম খাওয়া।
- ভারী চেহারা হলে ওজন কমানো। ডেয়ারি প্রোডাক্ট বা দুধজাতীয় খাবার কম খাওয়া।
- সয়া জাতীয় খাবার খাওয়া।
- চকোলেট, কফি, সোডা, তামাক জাতীয় দ্রব্য এড়িয়ে চলা।
- সব সময় টাইট, ফিটিংস অন্তর্বাস ব্যবহার করা।

কারও কারও ক্ষেত্রে ডাইইউরেটিক ট্র্যাংকুইলাইজার বা টেনশনের ওষুধ দিয়েও চিকিৎসা করা হয়। প্রয়োজনে ভিটামিন-ই ৪০০-৬০০ i.v/day পরিমাণে খেতে হয় প্রতিদিন। সঙ্গে ভিটামিন বি৬, মাল্টিভিটামিন, বি-কমপ্লেক্সও দেওয়া হয়। এফ বি ডি-র ক্ষেত্রে ইভনিং প্রিমরোজ অয়েল (Evening Primrose oil) সংক্ষেপে ইপিও খুব উপকারি। এই ইপিও-র সঙ্গে ভিটামিন জাতীয় ওষুধ মেশানো ট্যাবলেট পাওয়া যায়। এই ট্যাবলেট এফ বি ডি-র সমস্যা দূর করতে বেশ কার্যকর।

এই সমস্ত সাধারণ ওষুধে না কমলে অনেক সময়ে হরমোন দিয়েও চিকিৎসা করা হয়। যেমন পিরিয়ডের দ্বিতীয়ার্ধে প্রোজেস্টেরন হরমোন। তাছাড়া ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, ডানাজোল (DANAZOL) ব্রোমোক্রিপটিন (BROMOCRIPTINE) ব্যবহারেও ভালই উপশম হয়।

খুব কম ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় অপারেশনের।

ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে
ডা. ইলোরাশ্রী চক্রবর্তী
email : ilorasri@yahoo.com
ফোন ৯৮৩০২৭৭৪৫৭/৯৮৩৬২৮২৫৭৭

মনে রাখুন

অনেক মহিলাই স্তনে কোনও সমস্যা হয়েছে বুঝলেও লজ্জা বা ভয়ে চিকিৎসকের কাছে যেতে চান না। তাঁরা আরও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন, স্তনে ক্যান্সার হয়েছে এই ভেবে এবং এই পুরো ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চান। এটা কিন্তু কোনও সমাধান নয়। স্তনের যে কোনও সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন, চিকিৎসা করান। অহেতুক ভয় ভবিষ্যতে ক্ষতির কারণ হতে পারে। প্রথমাবস্থায় ধরা পড়লে কোনও রোগই রোগীর ক্ষতি করতে পারে না। 'সেল্‌ফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন' নিয়মিত করলে অনেক সমস্যা থেকে দূরে থাকা সম্ভব। কাজেই সচেতন হোন, কিন্তু আতঙ্কি ত হবেন না।

পুজোর স্পেশাল রেসিপি

আনন্দ উৎসব

পুজোয় সবাই মজা করেন, নানারকম খাওয়া দাওয়া করেন, লোক খাওয়ান। এবার পুজোয় কিছু সেলিব্রিটি কী করবেন, কী খাবেন, কী রান্না করবেন তা জেনে এসেছেন অরিজিৎ দত্ত ও সুমন ভাদুড়ী

পুজোর ক'দিন আদিবাড়িতে থাকি

কোয়েল মল্লিক

পুজোটা প্রতিবারের মতো এবারও আমাদের আদিবাড়িতেই কাটাবো। আদিবাড়ি বলতে আমাদের মল্লিকবাড়ি। সারা বছরে এটাই একটা সময় যখন পুরো পরিবার একসঙ্গে হই। তাই এই সময় নো কাজ। যাদের সঙ্গে সারা বছর কাজ করি তারাও এই সময় আমাকে ছাড় দেন। কোনও শুটিং রাখেন না। সেই ছোট বেলা থেকে এখনও পুজোটা একই রকম আমার কাছে। তবে দায়িত্ব বেড়েছে। এখন পুজোয় আমি অনেক সাহায্য করি। ফল কেটে দিই, রেকাবি

সাজিয়ে দিই। খাওয়া দাওয়া পরিবেশন করি। আরও অনেক কিছু আমার দায়িত্ব। তবে এখনও পুজোর সময় ঠাকুমাদের কাছে আমি রঞ্জুর মেয়ে (রঞ্জিত আমার বাবা) বলেই পরিচিত। দায়িত্ব বাড়ুক, বড় হই, অভিনেত্রী হই, যাই হই না কেন, ঠাকুমারা মাঝে মাঝে আমার নামই ভুলে যান। 'এই রঞ্জুর মেয়ে এদিকে আয়' বলে ডাকেন। এটা খুব ভাল লাগে। আমাদের বাড়িতে বহু বছর ধরে দুর্গাপ্রতিমা হয়ে আসছে। সেই প্রতিমা গড়া থেকে ভাসান পর্যন্ত যে আনন্দ আমরা সবাই মিলে করি তার তুলনা হয় না। আমরা সব ভাইবোন এক সঙ্গে পুজোয় অংশ নিই। এই বাড়ির পুজোটার একটা ঐতিহ্য আছে। এখন যিনি প্রতিমা গড়েন তাঁর বাবা, ঠাকুরদাও আমাদের প্রতিমা তৈরি করতেন। পুজোর সবকিছু হয় খুব নিয়ম মাফিক। সবটাই সময় মেনে চলে। এসব ঠিক করে দেন ঠাকুর মশাই। পুজোর সঙ্গে অনেক ছোটখাটো নিয়মকানুন

স র্ষে ই লি শ

কী কী লাগবে

মাছ : ৬ টুকরো ; সর্ষে : ৩ চা চামচ ; নারকোল কোড়া বাটা : ২ চা চামচ ; হলুদ গুড়ো : ½ চা চামচ ; টক দই : ১ চা চামচ ; নুন : পরিমাণ মতো ; কাঁচালঙ্কা : ৬টি ; সর্ষের তেল : ৪ টেবিল চামচ।

কী করে করবেন

মাছের টুকরো পরিষ্কার করে ধুয়ে, নুন, হলুদ মাখিয়ে রাখতে হবে। একটা ছোট বাটিতে বাকি হলুদ ও নুন একটু জল দিয়ে গুলে রাখুন। কড়াতে ১ টেবিল চামচ তেল গরম হলে, নুন মেশানো হলুদ জলটা ঢেলে তার উপর মাছের টুকরোগুলো সাজিয়ে দিন। মাছ, একবার ওপিঠে উল্টে দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে তার উপর সর্ষে বাটা, নারকোল বাটা ও দইটা অল্প জল দিয়ে গুলে, ঢেলে দিন আস্ত কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, ঢেকে রাখুন। তিন-মিনিট পর ঢাকনা সরিয়ে বাদবাকি অর্থাৎ তিন টেবিল চামচ তেল ঢেলে, এক মিনিট রেখে নামিয়ে দেখুন। সর্ষে ইলিশ তৈরি। এখন শুধু পাতে দেওয়ার অপেক্ষা। একটা কথা মনে রাখবেন সর্ষে বাটার সময় তাতে চারটে কাঁচালঙ্কা ও এক চিমটে হলুদ দিতে ভুলবেন না।

জুড়ে থাকে। যেমন আগে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমাকে বলা হত পা ঢেকে শান্তির জল নিতে। আর এখন যারা ছোট তাদের আমি শেখাই এগুলো। অনেক মজার নিয়ম আছে। যেমন প্রাণ বিসর্জন হয়ে গেলে একটা থালায় হলুদ গোলা জলে প্রতিমার পায়ের ছায়া দেখে একটা দুটো টাকা দিয়ে প্রণাম করতে হয়। এটা খুব মজার। তাছাড়াও আমাদের বাড়িতে সিঁদুর খেলা হয় খুব জমিয়ে। তবে একটা ব্যাপার আছে যাঁরা বিবাহিত তাঁরাই কেবল এটা খেলতে পারে আর অন্যরা ওপর থেকে দেখে। প্রচুর নাচগান হয় এই পুজোর সময়। পিসিরা খুব ভাল নাচেন। অনেকেই আছে আমাদের বাড়িতে যাঁরা খুব ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি গান। আমরাও অংশ গ্রহণ করি। তাছাড়া ভাসানেও খুব হইহুল্লোড় করি। যেহেতু বাড়িতেই পুজো হয় তাই বাইরে যাওয়া খুব একটা হয় না। একাদশীর দিন সব ভাইবোনরা রাত করে ঠাকুর দেখতে বেরোই। আর এই সব ছাড়াও পুজোর মজার মধ্যে আরেকটা বড় জিনিস হল প্রচুর খাওয়া দাওয়া। পুজোর সময় আমি কোনও রকম ডায়াট মানি না। আমাদের বিশাল পরিবার তাই রান্না বান্নাও হয় প্রচুর। পুজোর ক'টা দিন আমরা নিরামিষ খাই। নানান রকম পদ রান্না হয়। লুচি, পোলাও, খিচুরি, আলুর দম, মোচার ঘন্ট, বেগুনি, আলুভাজা, আলুপোস্ত, শুক্তো, পাঁচ মিশালি তরকারি, পায়েস, মালপোয়া, মিষ্টি, চাটনি আরও কত কী। এই সব খাওয়া দাওয়া হয় আমাদের অন্নপূর্ণা দালানে। একাদশীর পর আমরা আমিষ খাই। মাংস, মাছ, মেটে চচ্চড়ি এইসব। রান্না বান্না আমি কিছুই পারি না সেরকম। তবে দু'একটা পদের রেসিপি কিন্তু আমি জানি। যেমন মেটে চচ্চড়ি।

পুজোয় দেদার খাওয়া

তনিমা সেন

পুরো পুজোটা আমি এবার একটু ব্যস্ত থাকব নিজের ছবির প্ল্যানিং নিয়ে। পুজোর পরেই ছবির বাকি অংশটা শুটিং করতে হবে। পুজোর সময় বাড়ির সবার ছুটি থাকে তাই এক সঙ্গেই কাটাই। তাছাড়া পঞ্চমীর দিন আমার মেয়ের জন্মদিন। তাই সেদিনটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে। অন্যান্য দিন গুলো বাড়িতেই কাটাবো, কারণ এখন আর ভিড় ঠেলে ঠাকুর দেখতে ভাল লাগে না। টেলিভিশনের দৌলতে খানিকটা ঠাকুর দেখা সেরে নিই। কিন্তু দিনের বেলায় বেরোনোর চেষ্টা করব। তখন ভিড়টা কম থাকে। আরেকটা জিনিস আমি পুজোর সময় জমিয়ে করি সেটা হল রান্না। ওই ব্যাপারে আমার কোনও ক্লান্তি নেই। রেস্তরাঁয় পুজোর সময় যাওয়া খুব একটা হয় না। তার কারণ এই সময় বাড়িতে রান্না করতে পছন্দ করি। আমার খাওয়া নিয়ে তেমন কোনও বাছ বিচার নেই। বাঙালি খাবার, মোগলাই, চাইনিজ সব খাবারই আমার ভাল লাগে। আমার মিষ্টি খেতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু ডাক্তারের বারণ থাকে তাই আগের মতো আর মিষ্টি খাওয়া হয় না। যদিও লুকিয়ে লুকিয়ে খাই মাঝে মাঝে।

এমন নয় যে আমি শুধু খেতে ভালবাসি। আমি খাওয়াতেও পছন্দ করি। আগেই বলেছি রান্নাবান্না করতে আমার খুব ভাল লাগে। বিশেষ করে খাবার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারলে তো কথাই নেই। কয়েকদিন আগে একটা চিকেনের আইটেম করেছিলাম সেটা আমি পুজোতেও করব। সেটা বেশ মজার।

মুসম্বি চিকেন

কী কী লাগবে

মুসম্বি : ৪টে; সবুজ আপেল : ২টো; পেঁয়াজ : বড় ৪টে; মুরগি : ১কেজি; সাদা তেল : অল্প; নুন, মিষ্টি : আন্দাজ মতো; কাঁচালঙ্কা : ৪/৫টা।

কী করে করবেন

মুরগি পরিষ্কার করে কেটে অল্প জলে সেদ্ধ করে নেবেন। এতে চারটে পেঁয়াজও সেদ্ধ করবেন। বার করে পেঁয়াজ সেদ্ধ, মুসম্বি (কেটে, বিজ ছাড়িয়ে) ও সবুজ আপেল মিক্সিতে ঘুরিয়ে নেবেন। কড়াইয়ে অল্প তেল গরম করে মুসম্বি-আপেল-পেঁয়াজের কাথ অল্প ভাজা ভাজা করে তাতে মুরগিটা দিয়ে দিন। ৪/৫ টা কাঁচালঙ্কা চিরে দিন। মাখা মাখা করে রান্না করুন। আন্দাজ মতো নুন-মিষ্টি দিন। এবার নামিয়ে দেখুন কেমন হল মুসম্বি চিকেন।

সবরকম বাঙালি খাবার খাই

পায়েল সরকার

এবার পুজোয় কোলকাতায় থাকার ইচ্ছে। গত কয়েক বছর থাকতে পারিনি তাই এবার চুটিয়ে মজা করার প্ল্যান আছে। বেশিরভাগটা বাড়িতেই কাটাব। আর আড্ডা মারব বন্ধুদের সঙ্গে। শেষ কয়েকটা বছর বম্বেতে থাকার ফলে অনেক বন্ধুদের সঙ্গেই দেখা হয়নি, সেটা এবার পুজোয় হবে। ইচ্ছে থাকলেও আগের মতো আর ভিড় ঠেলে ঠাকুর দেখা হবে না। কিন্তু অঞ্জলি দেবই। পুজোর দিনগুলোতে তো আমরা মজা করিই। কিন্তু পুজো আসছে এই ব্যাপারটা অদ্ভুত একটা আনন্দ দেয় আমায়। ওই যে বলে না পুজো পুজো গন্ধ। প্রচুর কেনাকাটা, নতুন নতুন জামাকাপড় এই সবই আমার খুব প্রিয়। আমি খেতে খুব ভালবাসি। কে না বাসে? সারা বছর ডায়েট মেনটেন করতে গিয়ে পছন্দের কিছুই খাওয়া হয়ে ওঠে না। কিন্তু পুজোর সময় আমি খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সব নিয়ম ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব। নানারকম খাবার পুজোর সময় আমার লিস্টে ঢুকে যাবে। বাঙালি খাবার, থাই, চাইনিজ। বিশেষ করে চাইনিজ আমার খুব প্রিয়। আর এই সব খাওয়া দাওয়ার জন্য বেশ কিছু রেস্তোরাঁও আমার বাছা আছে। যেমন, মেনল্যাণ্ড চায়না, ও ক্যালকাটা। পার্কস্ট্রিট-এর বেশ কিছু রেস্তরাঁ আছে যা আমার পছন্দ। আমি যে শুধু বাইরে খাই তা নয় আমরা বাড়িতে খেতেও খুব ভাল লাগে। সারা বছর তো সেভাবে বাড়িতে সবার সঙ্গে বসে খাওয়া হয় না। তাই দুপুরের দিকে বাড়িতে জমিয়ে খাবো। তাতে থাকবে ইলিশ, চিকেনের নানা আইটেম, পোলাও আর খিচুরি খাওয়ারও ইচ্ছে আছে মাছ ভাজা দিয়ে। রান্নাবান্না করতেও আমার খুব ভাল লাগে। মোটামুটি সবরকম বাঙালি খাবার আমি রান্না করতে পারি। শুধু মটন আমি খাই না। বাকি কোনও কিছুতেই আমার কোনও আপত্তি নেই।

আমি চিংড়ির পোকা

সন্দীপ্তা সেন

এই দিনগুলোর জন্য আমি সারাবছর অপেক্ষা করে থাকি। তাই পুজোর সময় দু'একটা উদ্বোধন ছাড়া আমি কোনওরকম কাজ রাখি না। পুজোতে বাড়িতে বেশি সময় দিই। আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিই। এবার কোনও বন্ধুর পাড়ার পুজোয় চলে যাব সেখানে চলবে অনেক রাত অবধি আড্ডা। দেশপ্রিয় পার্কের পুজোতে স্টার জলসার আড্ডাতে গতবছর খুব মজা করেছিলাম, এবারও যাব। ওটা একেবারে নিজের ঘরের মতো। গত বছর ম্যাডক্স স্কোয়ারে গিয়েছিলাম। এবং বেশ বিপদে পড়েছিলাম। কারণ প্রচুর লোক দুর্গা সিরিয়ালের দৌলতে চিনতে পেরেছিল আর ছেঁকে ধরেছিল। সেই ভিড় সামলাতে হিমসিম খেতে হয়েছিল আমায়। এইসব দিক ছাড়াও পুজোর সব থেকে আকর্ষণীয় দিক হল খাওয়া দাওয়া। আমি খেতে ব্যাপক পছন্দ করি। আর পুজোয় খাওয়া দাওয়ার জন্য যে সব খাদ্যকেন্দ্রে যাই, সেগুলো সারা বছর ধরে

চিংড়ি বাটা

কী কী লাগবে

চিংড়ি মাছ: ৬টা (মাঝারি); পেঁয়াজ: ২টো; রসুন বাটা: বেশ খানিকটা; কালোজিরে: ফোড়নের জন্য আধ চা-চামচ; নুন, হলুদ, মিষ্টি : আন্দাজ মতো; লংকাবাটা আধ চা-চামচ বা ১চা-চামচ; কাঁচা লঙ্কা : ৪/৫টা (চিরে); তেল : প্রয়োজন মতো (অল্প)।

কী করে করবেন

চিংড়ি মাছগুলো ধুয়ে, ছাড়িয়ে, মাথা আলাদা করে শুধু মাঝের অংশটা হালকা করে ভেজে নিন। ভাজা মাছ মিক্সিতে বা শিলনোড়ায় বেটে নিন। পেঁয়াজ দুটো বাটবেন, আর মাছবাটা যতটা হল তার অর্ধেক রসুনবাটা নিন। হালকা তেলে কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে, তাতে রসুন, পেঁয়াজবাটা, লংকাবাটা দিয়ে সাৎলে নিন। মশলা ভাজা হলে, চিংড়ি বাটা দিয়ে ভাল করে রান্না করুন। নুন, হলুদ, চিনি দিন, মাখা মাখা হলে নামিয়ে খেতে দিন।

বিভিন্ন জায়গায় খাওয়ার ভিত্তিতে ঠিক করা হয়। তবে একটা কথা বলা উচিত বাঙালি হলেও ইলিশ মাছ একদম খাই না। আমি চিংড়ি মাছের পোকা। এছাড়া আর সবই খাই। কাবাব খুব ভাল লাগে। আমি রান্না করতে পছন্দ করি। বিশেষ করে খাবার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে। বাঙালি খাবার মোটামুটি সবই রান্না করতে পারি। তাছাড়াও নানা জায়গা থেকে রেসিপিও যোগাড় করি। আমি সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করি। সাইকোলজির নোট ছাড়াও নানারকম রান্নার রেসিপি আমার সাইকোলজির নোটবুকের পাতায় থাকে। তবে সম্প্রতি দু'টো চিকেন আইটেম শিখেছি সেটা নিয়ে খুব উত্তেজিত। সেটা হল রাজমা উইথ চিকেন আর চিলিচিকেন।

ভোজনরসিক হিসেবে রান্নাও করি

দীপঙ্কর দে

পুজো বলতেই মনে আসে ঢাক, ধূপ, ধুনো, ভোগ, নতুন জামাকাপড়, আতসবাজি, মন্ডপ, আলো, ভিড়, জাঁকজমক আর খাওয়া দাওয়া। পুজো ব্যাপারটাই দারুণ আর অন্যরকম তো বটেই। তবে এবার পুজোয় ষষ্ঠী, সপ্তমী কলকাতায় কাটিয়ে চলে যাব লণ্ডন। কারণ পুজোর সময় কাজের চাপটা কম থাকে। তবে

অন্যান্যবার পুজোয় কলকাতা থাকলে পুজোর মজাটা ষোলোআনাই উপভোগ করি। ঠাকুর দেখি, আড্ডা দিই, আর প্রচুর খাওয়া দাওয়া করি। সাধারণত অষ্টমী নবমীর দিনে রাতের দিকে ঠাকুর দেখতে বেরোই। তাতে ভিড়টা খানিকটা হলেও এড়ানো যায়। আর এখন বিশেষ করে থিম পুজো আসায় গত কয়েক বছরতো পুজোগুলো আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটাও পুরো দমে চালাই। প্রচুর রেস্তরাঁ আছে যেগুলো আমার প্রিয়, যেমন মেনল্যাণ্ড চায়না, ও ক্যালকাটা, মার্কোপোলো, ওবেরয় গ্র্যাণ্ড, তাজ। আর মেনুতে থাকে নানা রকম খাবার। বিশেষ করে বাঙালি খাবার, চাইনিজ, মোগলাই আমার খুব প্রিয়। তাছাড়া ম্যাকডনাল্ড থেকে বার্গার খেতেও আমার ভাল লাগে। পুজোর সময় দিনের বেলায় সাধারণত বাড়িতেই খাই। ভোজন রসিক হিসেবে রান্না করতেও

চি লি চি কে ন

চিকেন (বোন-লেস্) : ৫০০ গ্রাম; রসুন : ৫০ গ্রাম; কাঁচালঙ্কা: ১০টা; পেঁয়াজ : ২০০ গ্রাম; ভিনিগার : ৪ টেবিল চামচ; সয়াসস : ৩ টেবিল চামচ; নুন : পরিমাণ মতো; কর্নফ্লাওয়ার : ৩ টেবিল চামচ; আজিনামোতো বা সোডিয়াম গ্লুটামেট: ½ চা চামচ; ক্যাপসিকাম : ১ টা (বড়); সাদা তেল : ১০০ গ্রাম।

কী করে করবেন

চিকেন আধখানা রসুন থেতো, কাঁচালংকা চেরা, সয়াসস, ভিনিগার ও নুন দিয়ে মেখে ১ঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচনো ও ½খানা রসুন থেতো দিয়ে, হাল্কা ভাজুন। তাতে মশলা ছাড়া শুধু চিকেন ছেড়ে দিয়ে, ঢেকে দিন। চিকেন সেদ্ধ হলে, যে মশলার ঝোলটা ছিল, তাতে সোডিয়াম গ্লুটামেট ও কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে, সেই ঝোলটা মাংসের উপর ছড়িয়ে দিন। একটু ফুটলেই নামিয়ে ফেলুন। ফ্রায়েডরাইস বা চাউমিনের সঙ্গে মন্দ লাগবে না।

চিংড়ি মাছের কালিয়া

কী কী লাগবে

খোসা ছাড়ানো চিংড়ি মাছ : ৪০০ গ্রাম; পেঁয়াজ বাটা: ১৫০ গ্রাম; রসুন বাটা : ১ চা-চামচ ; আদা বাটা : ১ চা-চামচ; হলুদ গুঁড়ো ½ চা-চামচ ; লঙ্কা গুঁড়ো ১চা-চামচ; নুন : ১ চা-চামচ; চিনি : ১½ চা-চামচ ; গরম মশলা : পরিমাণ মতো ; টম্যাটো : ১০০ গ্রাম; আলু (ইচ্ছে হলে) : ২টো (মাঝারি); সর্ষের তেল : ৬টেবিল চামচ।

কী ভাবে করবেন

মাছ ভাল করে ধুয়ে নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখবেন। আলু দিতে ইচ্ছে হলে, ছোট ছোট করে কেটে রাখুন। তারপর তেলের উপর পেঁয়াজ-আদা-রসুন বাটা, হলুদ-লঙ্কার গুঁড়ো, টম্যাটো ও নুন দিয়ে, নাড়ুন,যতক্ষণ না একটা সুগন্ধ বের হয়। তারপর তাতে মাছ ও আলু ভাজা দিয়ে একটু নেড়ে, পরিমাণ মতো জল দিয়ে, ঢেকে রাখুন। মাছ সেদ্ধ হলে, ঝোলের উপর চিনি ছড়িয়ে দেবেন। গরম-মশলার গুঁড়োও দিন। রান্না শেষ। ঘরে গাওয়া ঘি থাকলে, নামাবার আগে একটু ঘি দিলে, মন্দ লাগবে না।

দারুণ লাগে। যেমন, চিকেনের আইটেম, ডিমের ঝালঝাল কারি, চিংড়ি ভাপা, পেঁয়াজ বাটা দিয়ে চিংড়ি মাছের মাথা ভাজা। আর ইলিশ তো রয়েইছে তবে কাঁচালঙ্কা, কালোজিরে দিয়ে ইলিশটা আমি খুবই ভাল বানাতে পারি আর খেতে তো বটেই।

পুজোয় সব ভেদাভেদ চলে যায়

সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়

গত কয়েক বছর হল পুজোর সময় বাইরে বেড়াতে যাই। এবারও যাচ্ছি, তবে কোথায় যাচ্ছি তা এখনও ঠিক হয়নি। আমার বউ যেতে চায় পোর্ট ব্লেয়ার আর আমার ইচ্ছে ব্যাংকক, সেই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি। যেখানেই বেড়াতে যাই না কেন পুজোর ছুটিতে, পুজোর প্রথম দুটো কি তিনটে দিন কলকাতায় কাটিয়ে তবে বেড়াতে যাওয়া। কলকাতার পুজো কি ছাড়া যায়, অন্তত দুটো দিন কলকাতায় না কাটালে মনে হয় যেন পুজোটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

সবচেয়ে যে জিনিসটা ভাল লাগে—পুজোর এই কটা দিন মানুষ ছোট-বড়র ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মেতে ওঠে আনন্দে। সবার মুখে হাসি, সকলের মুখে একটা খুশি খুশি ভাব। এই পাঁচটা দিন সকলে সমান, কারও জীবনে এই সময় কোনও দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। দারুণ লাগে দেখতে। ছোটবেলার পুজো মানেই ছিল ক্যাপ বন্দুক, নতুন নতুন জামাকাপড়, বাবা-মার হাত ধরে পুজো দেখা। কলেজে পড়ার সময় বান্ধবীদের সঙ্গে পুজো দেখতাম। তখন পুজোর একটা প্রধান আকর্ষণ ছিল মেয়ে দেখা, মেয়ে অবশ্য এখনও দেখি, সুন্দরী মেয়ে দেখলে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। তবে তার আগে দেখে নিই মেয়েটার সঙ্গে যে বয়-ফ্রেণ্ড আছে তার সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠব কি না।

ইদানীং অবশ্য পুজোয় ঠাকুর দেখা ছেড়ে দিয়েছি, পুজোর ভিড়টা সহ্য করতে পারি না বলে। তবে আড্ডা, খাওয়া দাওয়া—এগুলো এখনও আগের মতোই চলছে। আমি খুব খেতে ভালবাসি এবং পুরোপুরি আমিষাশী। তাই সারা বছর ভালমন্দ খাওয়া দাওয়া চলে। তাছাড়া কর্মসূত্রেও সারা বছরই বাইরের খাবার খেতে হয় বলে পুজোর সময় রেস্তোরাঁয় খেতেই হবে, এ ব্যাপারটা এখন আর নেই। তার ওপর পুজোয় রেস্তোরাঁগুলোয় যা ভিড় হয়, সেই ভিড়ে সামিল হয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে খাবার খেতে আর ইচ্ছে করে না।

পুজোর দিনগুলোয় তাই দুপুরের খাবারটা বাড়িতেই খাই। আমার বউটি খুব ভাল রাঁধে, সে-ই রান্না করে—ইলিশের নানা পদ, ডিমওয়ালা ট্যাংড়া, মটন ভিন্ডালু ইত্যাদি। আর রাতে যেহেতু কোনও না কোনও বন্ধুর বাড়ি যাই আড্ডা দিতে, তাই রাতের খাবারটা আশপাশের কোনও রেস্তোরাঁ থেকে আনিয়ে নিই।

এমনিতে কলকাতা শহরে ভাল খাবারের দোকানের অভাব নেই, আর আজকাল তো ছোটখাটো পাড়ার দোকানগুলোও কোনও অংশে কম যাচ্ছে না। তবু আমার পছন্দের তালিকা দিতে বললে ট্যাংরার কিমলিং রেস্তোরাঁর শ্রেডেড প্রণ, আইটিসি সোনার -এর মটন লাল, পার্ক হোটেলের একটা বোনলেস ওয়াইট গ্রেভির মুরগির পদ (নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না)। সিরাজ-এর বিরিয়ানি চাঁপ এর কথা বলতেই হবে।

পাড়ার খাবার খেতে ভাল লাগে

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী

কলকাতায় পুজো কাটাবার ইচ্ছে থাকলেও প্রতিবারই সপ্তমী-অষ্টমীর দিন আমাকে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে পড়তে হয়। কারণ আমার বন্ধুরা এই পুজোর সময়টা বাদে বছরের আর কোনও সময় টানা অতগুলো দিন ছুটি পায় না। এ বছর যাচ্ছি উত্তরবঙ্গের তিনচুলা। তবে কলকাতার পুজোর সেই ভিড় ঠেলে ঠাকুর দেখা, আড্ডা, খাওয়া দাওয়া—এসব মিলে পুজোর পাঁচটা দিন জমজমাট। আরও আছে— মেয়ে দেখা। পুজোর সময় মেয়ে দেখতে আজও আমার দারুণ লাগে। বিশেষ করে অষ্টমীর সকালে যখন সবাই শাড়ি পরে মণ্ডপে মণ্ডপে অঞ্জলির জন্য ভিড় করে। আর তখনই বুঝতে পারি পুজোর সময় বয়সটা কেন ঝপ করে অনেকখানি কমে যায়। সে কারণেই হয়তো ভিড় ঠেলে ঠাকুর দেখতেও কোনও অসুবিধে হয় না। প্রতিবছরই কোনও না কোনও পুজো প্রতিযোগিতার নির্বাচক মণ্ডলীতে থাকার সুবাদে বছরের সেরা পুজোগুলো আমার ঘোরা হয়ে যায়। তবে আজকাল পাড়ার

অনামী পুজোগুলোও সব এক সে বড়কর এক, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। এবার আসা যাক পুজোর প্রধান আকর্ষণে— খাওয়া দাওয়া। এমনিতে সারা বছরই আমার খাওয়া দাওয়ার উপর ডাক্তারের নানা নিষেধাজ্ঞা থাকে। তবে পুজোর পাঁচ দিনের নিয়মই হল নিয়মভাঙা। পুজোর ক'দিনে বাড়ির খাবারের থেকে বাইরের খাবারই আমার বেশি পছন্দ। আর কলকাতা শহরের বিশেষত্বই হল এখানে ভাল খাওয়া দাওয়া করার জন্য আলাদাভাবে রেস্তোরাঁ খোঁজার দরকার হয় না। পাড়ায় পাড়ায় রাস্তায় ঘাটে প্রচুর ছোট-বড়-মাঝারি দোকান পাওয়া যায় যাদের খাবার অসাধারণ। আর প্রতিটি দোকানের একটা করে বিশেষত্ব বা স্পেশ্যালিটি থাকে। যেমন এই মুহূর্তে মনে পড়ছে ভবানীপুরে গাঁজা পার্কের কাছে ফুটপাতে মাত্র সাত টাকায় অত্যন্ত সুস্বাদু চিকেন চাঁপ পাওয়া যায়। বালিগঞ্জের মুখার্জি সুইটস-এর মটন চপ, অথবা ক্যামাক স্ট্রিট-এর একটা রাস্তার দোকানে নানা স্বাদের কুলফি—যেমন স্ট্রবেরি কুলফি, আনারস কুলফি, কাঁচা আমের কুলফি, পাকা আমের কুলফি ইত্যাদি। আর নিজে খাঁটি খাদ্যরসিক বলেই হয়তো উত্তর কলকাতার বিখ্যাত মিত্র কাফের কাটলেট, গোলবাড়ির কষা মাংস-পরোটা (মাংস খেতে আমি খুব ভালবাসি) আর দক্ষিণ কলকাতার ও ক্যালকাটা রেস্তোরাঁ বা পার্ক স্ট্রিট-এর পিটার ক্যাট-এর চেলো কাবাবও বড় ভাল লাগে।

মেটে চচ্চড়ি

কী কী লাগবে

মেটে ২৫০গ্রাম; আলু ২টো (মাঝারি মাপের) ; পেঁয়াজ : ১৫০ গ্রাম (মাঝারি মাপের ৪টে); রসুন : ১০ কোয়া ; আদা : পরিমাণ মতো ; হলুদ গুঁড়ো ½ চা-চামচ; লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা-চামচ; টম্যাটো ১০০ গ্রাম ; নুন : পরিমাণ মতো; চিনি : ২চা চামচ; গরম মশলা গুঁড়ো : পরিমাণ মতো; সর্ষের তেল : ৫ টেবিল চামচ।

কী করে করবেন

মেটে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নেবেন। আলুও ছোট ছোট টুকরো করে কাটবেন। আগে আলু ভেজে তুলে রাখবেন। পেঁয়াজ সরু সরু করে কুঁচিয়ে নেবেন। আদা ও রসুন বেটে নিন। কড়াতে পুরো তেল ঢেলে, গরম হলে, তাতে ¾ পেঁয়াজ কুঁচো দিয়ে, লাল করে ভেজে, আদা-রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, টম্যাটো, ও নুন দিয়ে দিন। মশলা ভাজা হলে তাতে মেটের টুকরো আর বাকি ¼ পেঁয়াজকুচি দিয়ে কষুন। ভাজা আলু দিয়ে এবং অল্প জল দিয়ে, ঢেকে দিন। মেটে সেদ্ধ হলে, তাতে চিনি ও গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে, একটু নেড়ে-চেড়ে নামান। মেটে-চচ্চড়ি রেডি। ভাল লাগলে ওপরে একটু গাওয়া ঘি ছড়িয়ে দিতে পারেন। রুটি বা পরোটার সঙ্গে জমবে ভাল।

পুজোর ক'দিন নো ডায়েট

রিমঝিম মিত্র

সে রকম কোনও বিশেষ প্ল্যান নেই। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। পুজোটা আমি জমিয়ে কাটাব, আমি জানি। মানে যে মজাটা অন্যান্যবার করে থাকি, এবারও তাই করব। প্রচুর আড্ডা দেব বন্ধুদের সঙ্গে। প্রতিবারই আমার পুজো পরিক্রমাগুলো থাকে, সেই সুবাদে ঠাকুর দেখাও সেরে নিই। পুজোর বেশিরভাগ সময় কাটাই পাড়ার পুজোয়। খুব মজা করি। আগে ম্যাডক্স স্কোয়্যারের পুজোয় যেতামই, কিন্তু এখন আর তেমন যাওয়া হয় না। বাড়িতেও সময় দিই। বাড়িতে পুজোর সময় প্রচুর আত্মীয় পরিজন আসেন। এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, আড্ডা গানবাজনা চলে। যদিও গান আমি গাইতে পারি না কিন্তু প্রচুর খাই আর আড্ডা মারি। এই খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারটা আমি জমিয়ে করি। পুজোর দিনগুলোতে আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাস্তার খাবার প্রেফার করি। কারণ আমার মনে হয় রেস্তরাঁর চেয়ে স্ট্রিট ফুডের দোকানগুলোতে বেশি ফ্রেশ আর টেস্টি খাওয়ার পাওয়া যায়। প্রচুর জাঙ্কফুড খাওয়া হয় এই সময়। আর আমি কখনওই ডায়েট করি না পুজোর ক'দিন। চাইনিজ বেশি ভাল লাগে। কিছু কিছু রেস্তরাঁ আছে যেখানে আমি সারাবছরই খাই। যেমন, নসিমান, তন্দুরপার্ক, মুন, মেনল্যান্ড চায়না। বাড়ির খাবারও খাই। আমার মা খুব ভাল রান্না করেন। দু-একটা জিনিস আমিও রান্না করতে পারি। যেমন, চা, কফি, ভাত, ডিম সেদ্ধ, ডিম ভাজা, আলুভাজা। তাহলে? হাম ভি কিসিসে কম নেহি!

পুজোর দিনে ৪ কন্যা

এবার পুজোয় চার নায়িকার সাজ কেমন হতে পারে দেখে নিন।

ঈপ্সিতা

সপ্তমীর ঝকঝকে সকালে, ঈপ্সিতার মতোই সাজতে পারেন মঙ্গলগিরির উপর ছাপা ইট রঙা শাড়িতে। ‘সুবর্ণলতা’ ধারাবাহিকে কাজ করতে গিয়ে ক্লাস সেভেন-এর ছাত্রী শাড়ি পরা ধরেছিল। তবে সেটা আটপৌরে করে। পুজোর দিন মোটে সেভাবে শাড়ি পরবে না ঈপ্সিতা। পরবে কুচি দিয়ে। সঙ্গে

কানে বড় দুল-ও, কুন্দন কাজ করা। চোখে দেবে কাজল তাতে বড় লাগবে চোখটা। চুল খোলা। ছোট্ট মেয়ে বড়র সাজে তৈরি।

শাড়ি : কনিষ্ক,
গয়না : অঞ্জলি জুয়েলার্স

অষ্টমীর সাজ হওয়া চাই জমকালো। তাই সোনালি পরবেন নেট-এর উপর লাল সিলভার কাজ করা এই শাড়ি। খোপা নয়, নিজের চুলটাই হট রোলার্স দিয়ে কার্ল করে ছেড়ে রাখতে পছন্দ করে সোনালি। তাতে চেহারায় আসে অন্য মাত্রা। সঙ্গে সাদা পাথরের সেটিং-এর গয়না। একেবারে জ্যামিতিক

নকশার, যা এ যুগের সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই। অষ্টমীতে চোখ ঝলসানো সাজ আরও আকর্ষক করতে চোখের প্রসাধনে জোর দিয়েছেন সোনালি।

গয়না : অঞ্জলি জুয়েলার্স

কনীনিকা এখন মুম্বই কলকাতা যাতায়াত করেন। আবার তাকে বাংলা ধারাবাহিকে দেখা যাচ্ছে। নবমীতে একেবারে ভারতীয় পোশাক না পরে কনীনিকা পরতে চান ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক। তাই বেছে নিয়েছেন একেবারে ভারতীয় প্রিন্ট-এর নি-লেঙ্গথ স্কার্ট ও সঙ্গে গ্রে ব্লাউজ। ব্লাউজ-এর সঙ্গে হাতে

নিয়েছেন গোলাপি ফুলেল নকশা করা স্কার্ফ যা দিচ্ছে পোশাকে ঔজ্জ্বল্য। চোখের মেক আপ স্মোকি, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। চুলের ছাঁট অ্যাসিমেট্রিকাল, সামনে বড়, পিছনে ছোট।

পোশাক : কোরা

পায়েল সরকার এখন বাংলা সিনেমার প্রিয় নায়িকা। 'লে ছক্কা'র সেই অতি কনসারভেটিভ চশমা পরা ইমেজ ছেড়ে, বিজয়ার দিন লাল পাড় গাদোয়াল শাড়িটা তাই আদিবাসী ঢঙে পরেছেন পায়েল। সঙ্গে গলায় ডোকরা ও পুঁতির মালা, পায়ে পুঁতির মালা জড়ানো। সনাতনী শাড়িই এখন ওর চেহারায়

এনেছে অন্যমাত্রা। আসলে পায়েল পোশাক নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে খুবই ভালবাসে। শুধু তাই নয়, প্রসাধনে নানাধরনেঔ র লুক-ও ওর পছন্দ।

শাড়ি : কনিষ্ক

ছবি : আশিস সাহা
প্রসাধন : সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়
কেশ সজ্জা : বেবি চৌধুরি

কাছে দুরে ২

মায়াময় প্রকৃতির অনন্যরূপ

শিলং-চেরাপুঞ্জি ঘুরে এসে ‘ফেলুদা’ ওরফে সব্যসাচী চক্রবর্তী মোহিত। তাই তাঁর সেই সফরের রোজনামচা লিখেছেন ‘সুবিধা’র জন্য। এই সফরে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন স্ত্রী মিঠু। প্রতি পদে তাঁরা ছবিও তুলেছিলেন। লেখার সঙ্গে রইল সব্যসাচীর তোলা ছবিও, যা আমাদের বাড়তি পাওনা

দমদম থেকে প্লেনে চেপে শিলং এয়ারপোর্টে পৌঁছনো গেল। ছোটখাটো ছিমছাম এয়ারপোর্ট। আমাদেরই সামনে আমাদের স্যুটকেস পত্তর নামিয়ে এনে দিয়ে গেল এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ। হোটেল এবং গাড়ি আগে থেকেই বুক করা ছিল। আমরাও আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে পড়লাম শিলং শহরের উদ্দেশে।

এয়ারপোর্ট থেকে শিলং শহরের দূরত্ব প্রায় ২৫ কিমি। আমাদের গাড়ির অহমিয়া চালকটি গৌহাটির ছেলে। সে শিলঙের রাস্তাঘাটের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত না থাকায় আমাদের হোটেলটা খুঁজে পেতে বেশ কিছুটা কষ্ট করতে হল। অবশেষে অনেক ঘুরে হোটেলে পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটা সুন্দর পোর্টিকো, একটা পরিষ্কার রেস্তোরাঁ আর একটা সুন্দর সাজানো বাগান সমেত হোটেলটা প্রথম দর্শনেই বেশ লাগল। বেশ সাবেকি ফ্যাশনে সাজানো ঘর, ঘরের অন্যান্য আসবাবের সঙ্গে যে বিশাল ডবল বেডটা রয়েছে তাতেও সাবেকি ছোঁয়া। ঘরে একটা আগুন জ্বালাবার জায়গাও মজুত ছিল। ঘরের টিভি সেটটার মুখটা দেখলাম খাটের দিকে না দিয়ে ঘরের বসবার জায়গার দিকে ঘোরানো। আর টেলিফোনটা খাট থেকে বেশ খানিকটা দূরে রাখা। আলোর সুইচগুলো ঘরের সব অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কেন তা বুঝতে পারলাম না। এও বুঝতে পারলাম না যে ঘরের কাঁচের দরজায় কোনও পর্দার ব্যবস্থা রাখা হয়নি কেন। ঘরের সংলগ্ন বাথরুমটা আবার দেখলাম আধুনিক আর তাতে গরম জলের জন্য ইলেকট্রিক গিজার লাগানো আছে। কল খুললাম। কই! এতো ঠাণ্ডা জল! এদিকে হোটেলের কাগজে লেখা : Hot water from 6.00am to 21.00 p.m বিকেলের দিকে একটা ঘটনা

ঘটল। আমার স্ত্রী মিঠু হঠাৎ দৌড়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল, ওর চোখে মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। কী হয়েছে? বাথরুমের আলো জ্বালালে নাকি ল্যাম্প হোল্ডার থেকে আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছে, জানাল ও। বোঝো! হোটেল কর্তৃপক্ষকে একথা জানানোয় তারা তক্ষুনি দু'জন লোক পাঠাল, সেটা ঠিক করার জন্য। তাদের কাছে গরম জলের ব্যাপারে জানতে চাওয়ায় তারা কলটা খুলে দিয়ে বলল, "গরম জল দরকার হলে কলটা খুলে কিছুক্ষণ জল পড়তে দিন, তারপরই দেখবেন কল দিয়ে গরম ফুটন্ত জল বেরোচ্ছে।" পনেরো মিনিট কলটা খুলে রাখা হল। এ অঞ্চলের বিখ্যাত বারাপানি লেকের দৌলতে শিলং-এ কোনও দিনও জলের অভাব হবে না জানি, তাই চোখের সামনে এমন জলের অপচয় দেখেও তা নিয়ে খুব একটা গা করলাম না। শেষে বাথরুম-এর ল্যাম্পের আগুনের ব্যাপারটা সমাধান করা গেলেও গরম জল আর আমরা পেলাম না। ২৫ মিনিট পরেও না। কর্তৃপক্ষের কাছে একটা শিলং গাইড ম্যাপ চাওয়ায় ওঁরা যে বইটা আমাদের পাঠালেন তা পুরো উত্তর-পূর্ব ভারত সম্পর্কে একটা মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা করার পক্ষে যথেষ্ট। ভালই হল। পড়ে ফেললাম। তারপর বেরোলাম ঘুরতে।

বেরোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে আজ বেড়াতে বেরোবার সিদ্ধান্তটা ঠিক হয়নি। প্রথমত, দিনটা ছিল রোববার (ফেব্রুয়ারির ২৮ তারিখ), তাই প্রায় কিছুই খোলা ছিল না। দ্বিতীয়ত, বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। চারিদিক অন্ধকার। তার ওপর আমাদের অহমিয়া ড্রাইভার-কাম-গাইডটি দেখি ভালভাবে জানেই না যে আমাদের কোথায় এবং কীভাবে যাওয়া উচিত। দু-দুবার আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেললাম। বরাতজোরে শেষপর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় হোটেলে ফিরলাম। সেটাই ভাগ্যি। সে রাত্রেই travel agent- কে ফোনে বললাম কাল সে যেন এমন একজন গাইডের ব্যবস্থা করে যে অন্তত ঠিকঠাকভাবে এই জায়গাটা চেনে এবং আমাদের ভালভাবে গাইড করতে পারে। আর বেশি রাত না করে, হালকা খাওয়া-দাওয়া করে আমরা সেদিন শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে (১মার্চ তারিখে) দেখলাম একটি নতুন ছেলে এসেছে। এও অহমিয়া। বাড়ি অসমের দিসপুরে, তবে বেশ কিছুদিন হল কর্মসূত্রে শিলং-এ আছে, এ-ই হবে আজ আমাদের গাইড। ছেলেটা দেখলাম বেশ হাসিখুশি আর চটপটে, মোটামুটি ভাল হিন্দিও বলতে পারে। মনে মনে আমার কলকাতার travel agent-কে ধন্যবাদ জানালাম। যাই হোক, ভারি একটা break-fast সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা তিনজন।

গাইড বই দেখে আমরা যে দ্রষ্টব্যের তালিকা তৈরি করেছিলাম তাতে ছিল ছ'টা জলপ্রপাত, একটা পাহাড়চুড়ো, এখানকার Airforce Museum আরও দুটো Heritage Museum, দুটো লেক, একটা চিড়িয়াখানা ও একটা বাজার। আমাদের প্রথম গন্তব্য এলিফ্যান্ট জলপ্রপাত, বেশ ভাল লাগল। তারপর গেলাম Airforce Museum, তবে সেটা

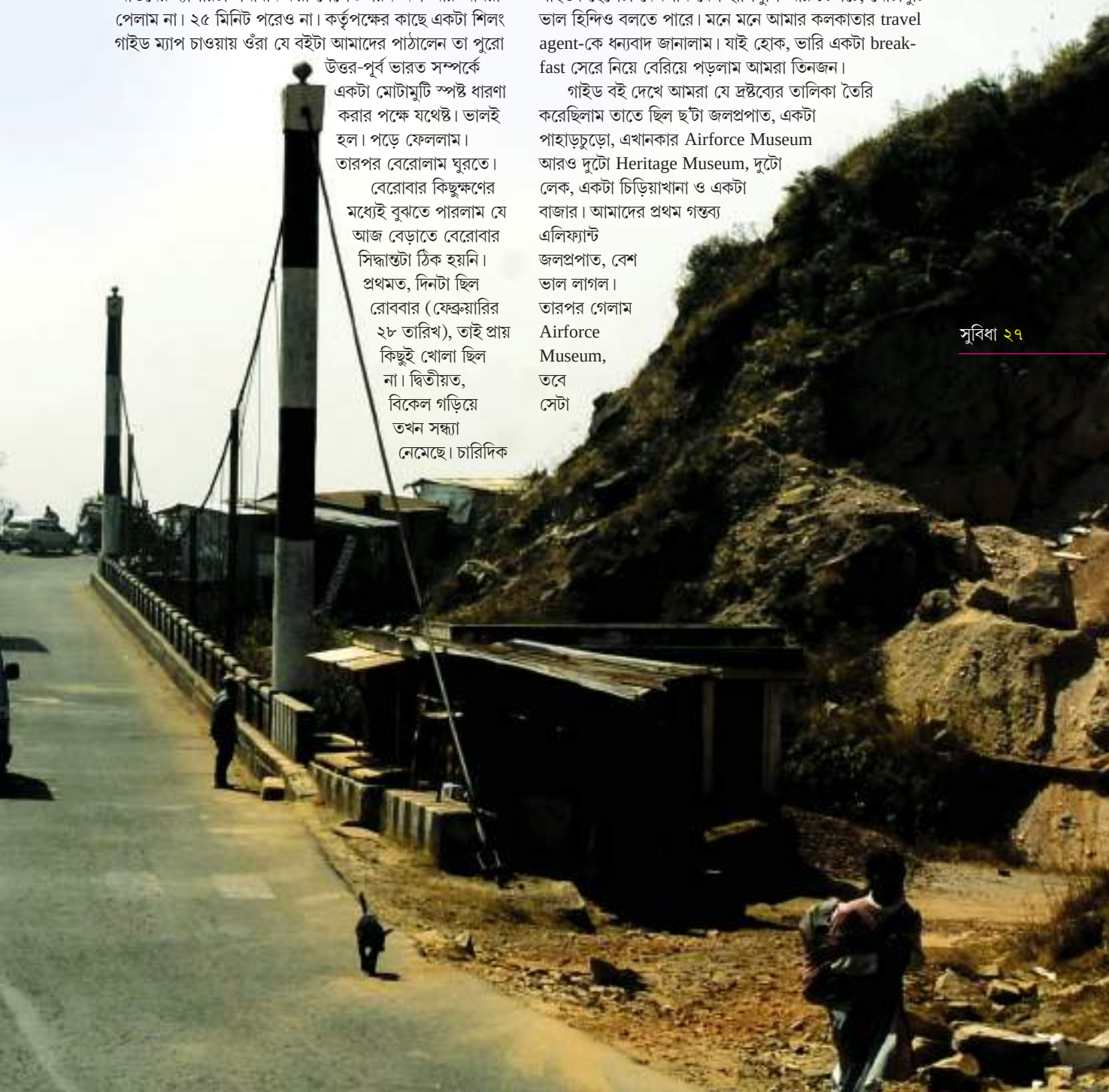

সোমবার করে বন্ধ থাকে বলে তা আমাদের দেখা হল না। তাই আমরা গাড়ি ঘুরিয়ে চললাম শিলং পিক। এখানেও পৌঁছে বিপত্তি। দেখি ঘন মেঘ আর ধোঁয়াসা চারিদিক ঢেকে দিয়েছে। নিচের শিলং শহরটা দেখাই যাচ্ছে না। কী আর করা, এবার অন্যান্য জলপ্রপাতগুলো দেখা যাবে কিনা জিজ্ঞেস করায় আমাদের গাইড ছেলেটি জানাল যে সে এই অঞ্চলে আর কোনও জলপ্রপাত আছে বলে শোনেনি। তাহলে এবার কোথায় যাব? লেডি হায়দারি পার্ক নামের চিড়িয়াখানা পৌঁছে দেখি সেটাও বন্ধ। এবার আমাদের গাইড আমাদের নিয়ে গেল ওয়ার্ডস লেক, যা শিলং শহরের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত। আমরা লেকের চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম, তারপর গেলাম ডনবস্কো হেরিটেজ মিউজিয়াম। এই প্রদর্শনশালায় কত রকমের কত ধরনের যে দ্রষ্টব্য আছে, তা লিখে বোঝানো শক্ত। তবে সবচেয়ে অসাধারণ অভিজ্ঞতা আমাদের হল যখন বহু চেষ্টার পর আমরা ওয়াংকার মেমোরিয়াল মিউজিয়াম খুঁজে বার করলাম এবং তা পরিদর্শন করলাম। স্বনামধন্য জীববিদ্যা বিশেষজ্ঞ এইচ আর সরকারের ব্যক্তিগত পোকামাকড়ের সংগ্রহ এই প্রদর্শনশালায় পেলাম। কতরকমের যে প্রজাপতি, মথ, বিটলপোকা, কাঠি-পোকা, মাকড়সা, মাছি, মৌমাছি ও আরো কতরকমের পোকামাকড় আছে এখানে তার ইয়ত্তা নেই, দেখলে তাজ্জব লাগে। সরকার সাহেবের নাতনি বর্তমানে এই সংগ্রহশালার দায়িত্বে আছেন। আমরা তাঁর সঙ্গেও কথা বললাম। এই মিউজিয়াম ঘুরে দেখতে দেখতে আমার বারবার মনে হচ্ছিল যে রাজ্য সরকারের উচিত এমন একটা অনন্যসাধারণ মিউজিয়ামের উন্নতি এবং এর দেশব্যাপী প্রচারের ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা।

পরের দিন (২রা মার্চ), অর্থাৎ আমাদের এই ট্রিপের তৃতীয় দিন। আমরা ঠিক করলাম যে সব দ্রষ্টব্যগুলো গত দু'দিনে দেখতে পারিনি বন্ধ থাকার কারণে তা দিয়েই দিনটা শুরু করব। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। প্রথম গন্তব্য লেডি হায়দারি পার্ক। আজ মঙ্গলবার তাই পার্ক খোলা। টিকিট কেটে ঢুকলাম। পার্কটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সবুজ লন আর সুন্দর সব ফুলের বাগান, বোঝাই যাচ্ছে পার্কের রক্ষণাবেক্ষণের পিছনে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। তবে পার্কে ঢুকেই প্রথম যেটা খারাপ লাগল তা হল খাঁচাবন্দি জন্তু-জানোয়ারদের করুণ ডাক। সম্বর হরিণ, বার্কিং ডিয়ার আর স্পটেড ডিয়ার-দের বেশ খোলামেলা জালি দিয়ে ঘেরা জায়গায় রাখা হয়েছে। অন্যান্য খাঁচায় দেখলাম, ব্রাউন ফিশিং আউলস, সজারু, ইয়েলো থ্রোটেড মার্টেন,রিসাস ম্যাকাও বাদর, হিমালিয়ান ব্রাউন বেয়ার, হক ঈগল, সার্পেন্ট ঈগল, পাম সিভেট ক্যাট, চিতাবাঘ আর শেয়াল। আরেকটা বড় খাঁচায় দেখলাম পন্ড হেরনস, লাইট হেরনস, রোজ রিংড প্যারাকিটস (টিয়া), পিনটেল ডাকস ইত্যাদি। আমি জন্তু জানোয়ার বরাবরই ভালবাসি। তবে কখনওই খাঁচাবন্দি অবস্থায় নয়। আশা করি আমাদের সরকার আমাদের চিড়িয়াখানাগুলোর সার্বিক উন্নতির জন্য কিছু একটা নিশ্চয়ই করবে। আর যদি না পারে তাহলে যেন এইসব জুওলজিকাল পার্ক তুলে দেয়। 'মানুষ দেখবে'-এই অছিলায় বেকার বেকার এই অবলা জন্তুগুলোকে কষ্ট দেওয়ার কোনও মানে হয় না। লেডি হায়দারি পার্ক দেখার পর আর অন্য কিছু দেখার সময় রইল না আমাদের হাতে, কারণ আজই আমাদের চেরাপুঞ্জি পৌঁছবার কথা। আমাদের গাইড এবার বিদায় নিলেন। আমরাও আর সময় নষ্ট না করে রওনা দিলাম চেরাপুঞ্জির পথে।

প্রায় ৪৫ মিনিট গাড়ি চলার পর আমরা একটা ব্রিজে এসে পৌঁছলাম যার নাম দুয়ান সিং ব্রিজ। এখান থেকে রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে যার মধ্যে ডান দিকের রাস্তাটা চলে গেছে সোহরার (চেরাপুঞ্জি) দিকে, আমরা সেটা ধরেই এগিয়ে চললাম। সোহরা পৌঁছবার কিছুটা আগে আমরা একেবারে ডানদিকের রাস্তাটা ধরে সোজা গিয়ে পৌঁছলাম ডেনথ্লেন জলপ্রপাতের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে তো আমরা থ। আমাদের সামনে একটা বেশ বড় জায়গা জুড়ে ভলক্যানিক রক ফরমেশন (আগ্নেয়গিরি থেকে উৎপন্ন পাথরের পথ)। স্থাপত্যের এমন নজির তো সহজে চোখে পড়ে না। এই পাথুরে এবড়ো-খেবড়ো জমির মধ্যে দেখলাম প্রচুর ছোট-বড় ফাটল রয়েছে যার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছে জল। কিছুটা এগিয়ে আমরা বিশাল পাথুরে জমির শেষ প্রান্তে পৌঁছলাম যেখান থেকে জল গড়িয়ে পড়ে জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। বর্ষা এখনও আসেনি, তাই প্রপাতেও জলের বেগ কম।

এই জলপ্রপাত দেখে আমরা সোহরা টাউন ফিরে এলাম। এখানে পৌঁছে জানতে পারলাম যে চেরাপুঞ্জি হলিডে রিসর্ট যেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, তা এখান থেকে প্রায় ১৮ কিমি দুরে। এগিয়ে চললাম আমরা রাস্তার আশপাশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে।

রিসর্ট পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের দুপুর দু'টো বেজে গেল। দুপুর আড়াইটে নাগাদ দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা একচোট ঘুমিয়ে নিলাম। বিকেলে একফাঁকে বেরিয়ে সোহরা টাউন থেকে আমার দরকার মতো রাতের রসদ কিনে ফিরে এলাম। সন্ধেটা আমরা কর্তা-গিন্নিতে মিলে শব্দছক খেলে কাটিয়ে দিলাম। রাতে সুস্বাদু নৈশভোজ এবং তারপর ঘুম।

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাস সেরে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম চেরাপুঞ্জির প্রাকৃতিক দ্রষ্টব্য পরিদর্শনে। আমাদের গাড়ির

পার্কে ঢুকেই প্রথম যেটা খারাপ লাগল তা হল খাঁচাবন্দি জন্তু-জানোয়ারদের করুণ ডাক। সম্বর হরিণ, বার্কিং ডিয়ার আর স্পটেড ডিয়ার-দের বেশ খোলামেলা জালি দিয়ে ঘেরা জায়গায় রাখা হয়েছে। অন্যান্য খাঁচায় দেখলাম, ব্রাউন ফিশিং আউলস, সজারু, ইয়েলো থ্রোটেড মার্টেন,রিসাস ম্যাকাও বাদর, হিমালিয়ান ব্রাউন বেয়ার, হক ঈগল, সার্পেন্ট ঈগল, পাম সিভেট ক্যাট, চিতাবাঘ আর শেয়াল।

চালকই আমাদের গাইড। সে প্রথমেই আমাদের নিয়ে পাহাড় দিয়ে নিচে নামতে লাগল। খানিকটা উৎরাইয়ের পর আমরা একটা অপূর্ব পাথর খণ্ডের ওপর এসে পৌঁছলাম। এখান থেকে আমরা গেলাম মোসমাই কেভস। এই গুহায় প্রাকৃতিক নিয়মে তৈরি অপূর্ব সুন্দর স্ট্যালগাটাইট ফরমেশন। আমরা গুহায় ঢুকলাম। তবে বেশিদূর এগোবার আগেই গুহাপথ সরু এবং গুহার ছাত নিচু হয়ে এল। আমার আবার ক্লস্ট্রোফোবিয়া আছে বলে আমরা আর বেশিদূর এগোলাম না গুহাপথে। গুহা থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম কাছাকাছি একটা বাজারে যেখান থেকে মিঠু কিছু কেনাকাটা করে নিল । তারপর আমরা গেলাম থাংকারাং পার্ক। এই পার্কটা একটা পাহাড়ের গায়ে গড়ে উঠেছে। কতগুলো ছোট ছোট মাছ-দীঘি, নানারকম গাছ, ফুলের বাগান, সবুজ লন, বাঁধানো হাঁটাপথ— সব মিলিয়ে বেশ মনোরম পরিবেশ। আর আছে পার্কের এক ধারে, পাহাড়ের একেবারে গায়ে, একটা বেড়া দেওয়া ভিউপয়েন্ট। যেখানে দাঁড়ালে উল্টোদিকের পাহাড় আর তার গা বেয়ে ওঠা রাস্তাটা স্পষ্ট দেখা যায়।

পার্ক পরিদর্শনের পর আমরা পাহাড়ি রাস্তা ধরে এঁকেবেঁকে নেমে এসে যেখানে পৌঁছলাম সেখান থেকে নিচে তাকালে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট সমতলভূমির একটা অসাধারণ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

এবার সোহরা ফেরার পালা। ফেরার পথে আমাদের ড্রাইভার আমাদের নিয়ে গেল বিখ্যাত নোওয়াখালি জলপ্রপাতে। এইসময় তাতে জলের পরিমাণ ছিল অতি অল্প। তবে চেরাপুঞ্জির বিখ্যাত বর্ষা যে এই জলপ্রপাতের তেজ পঞ্চাশগুণ বাড়িয়ে দেবে তা বুঝতে অসুবিধে হল না। ইশ, এটা যদি বর্ষাকাল হত তাহলে কী ভালই না হত। যাক গে, আমরা এখানকার অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করলাম। সঙ্গে এখানকার ক্রমাগত বয়ে চলা প্রচণ্ড হাওয়াও। তবে শুধু প্রকৃতি দেখে তো আর পেট ভরে না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল, সবারই বেশ খিদে পেয়েছে। আশপাশে কয়েকটা ছোটখাটো খাবার দোকান চোখে পড়ল, বেশি না ভেবে ঢুকে পড়লাম তার একটাতে। গরম গরম মোমো, চাউমিন আর ডিমের ওমলেট দিয়ে দুপুরের খাওয়া সারা হল। তারপর খাওয়া হল এক কাপ করে গরম ধোঁয়া ওঠা কফি। নোয়াখালি থেকে যখন আমরা আমাদের রিসর্ট-এ ফিরলাম তখন ঘড়ি বলছে বিকেল চারটে।

রিসর্ট-এর মালিক আমাদের রিসর্ট ঘুরে ঘুরে দেখালেন। এই রিসর্ট-এ একটা পাঁচ শয্যাবহুল ডর্মিটারি আর তিনটে টেন্ট-এর ব্যবস্থা আছে তা জেনে দারুণ লাগল, মনে মনে ভাবলাম যে পরবর্তী সময়ে কখনও আমার অন্যান্য ভ্রমণসঙ্গীদের সঙ্গে এখানে ঘুরতে এলে মন্দ হবে না।

নিজেদের ঘরে ফিরে আমার ক্যামেরা থেকে ল্যাপটপ-এ ছবিগুলো যখন ট্রান্সফার করতে শুরু করলাম তখন সূর্য প্রায় ডুবব ডুবব করছে। ট্রান্সফার করতে করতে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি বাইরে আকাশে ঘন মেঘ জমতে শুরু করেছে যা ধীরে ধীরে সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসে বাইরের এই মেঘলা আবহাওয়াকে ক্যামেরাবন্দি করে ফেললাম। সন্ধেবেলা খাসি ছেলেদের একটা গানবাজনার দল তাদের গান এবং নাচ দিয়ে চেরাপুঞ্জিতে আমাদের শেষ সন্ধে স্মরণীয় করে তুলল। বিশেষ করে ওদের নিজস্ব গানগুলোর কথা ও সুর আজও কানে লেগে আছে। অনুষ্ঠান শেষে আমরা ওদের কিছু টাকার টিপস দিলাম। এবং পাছে তাদের সম্মানে লাগে তাই জানালাম যে এই টাকাটা আমরা তাদের বকশিস হিসেবে দিচ্ছি না। বরং এজন্য দিচ্ছি যাতে তারা এই টাকাকটির সাহায্যে তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলোকে মেরামত

কতরকমের যে প্রজাপতি, মথ, বিটলপোকা, কাঠি-পোকা, মাকড়সা, মাছি, মৌমাছি ও আরো কতরকমের পোকামাকড় আছে এখানে তার ইয়ত্তা নেই, দেখলে তাজ্জব লাগে।

করতে পারে বা আরও উন্নত মানের বাদ্যযন্ত্র কিনতে পারে। ছেলেগুলো খুশি হয়ে টাকাটা গ্রহণ করল।

রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে সবে উঠেছি অমনি বৃষ্টি নামল। টিপটিপ দিয়ে শুরু হয়ে, ঝিরঝির, শেষে ঝমঝমিয়ে পড়তে লাগল বৃষ্টি। আমরা রিসর্ট-এর পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে উপভোগ করতে লাগলাম চেরাপুঞ্জির বিখ্যাত বৃষ্টি।

পরদিন সকালে উঠে দেখি চারিদিক কেমন ফ্যাকাসে হয়ে আছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। প্রকৃতি যেন আবছা একটা মেঘের চাদর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছুই ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না, সবই অস্পষ্ট। কী হবে এখন, আজ যে আমাদের কলকাতা ফেরার দিন! এই অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্ট পৌঁছতে পারব তো! আমাদের ড্রাইভার আশ্বাস দিল যে বেলা বাড়লে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। সকালের জলখাবার সেরে, রিসর্ট-এর সকলের থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিয়ে দিলাম আমরা।

ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে নামতে লাগল আমাদের গাড়ি। ততক্ষণে অবশ্য আশপাশটা খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে। চার কিমি চলার পর যখন আমরা পাহাড় থেকে নেমে এলাম। মেঘগুলো কোথায় যেন উবে গেল। পথে যে বৃষ্টি পেয়েছিলাম তাও হঠাৎই থেমে গেল। বুঝলাম আমরা মেঘের রাজ্য পেরিয়ে নিচে নেমে এসেছি। শিলং পেরোবার পর কিছুদূর এগোতেই আমরা পেলাম বিখ্যাত বারাপানি লেক। বিশাল বড় হ্রদ এটা। আমরা এর বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম। লেকের পাড়ে একঝাঁক নৌকো আর অন্যান্য কিছু জলযান বাঁধা রয়েছে দেখতে পেলাম। সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে আবার আমরা রওনা দিলাম।

এয়ারপোর্ট পৌঁছে আমাদের ড্রাইভার বিদায় নিল। তারপর আর কী, প্লেন ধরে কলকাতা ফেরা। আমাদের এই সফরনামা এখানেই শেষ। তবে সঙ্গে এটুকু যোগ করব যে যারা প্রকৃতিকে সত্যিই মনেপ্রাণে ভালবাসেন, উত্তর-পূর্ব ভারতে অন্তত একটিবার না গেলে মায়াময় প্রকৃতির একটা বিশেষ রূপ তাদের কাছে অধরাই রয়ে যাবে।

ফ্যামিলি সার্পোর্টের জন্যই কামব্যাক সম্ভব হয়েছে শ্রাবন্তী

ক্লাস ফাইভ-এ প্রসেনজিৎ-এর মেয়ে, ক্লাস টেন-এ জিৎ-এর নায়িকা। 'মায়ার বাঁধন' থেকে 'চ্যাম্পিয়ন'। শ্রাবন্তী-র উত্থান রকেট-গতিতে। মাধ্যমিকের শেষ পরীক্ষার আগেই বিয়ে আর পরের বছরই ছেলের গর্বিত মা। কী বুঝছেন? রকেট গতি সংসার জীবনেও! পাঁচ বছর গুছিয়ে সংসার করে আবার সুপার-ডুপার কামব্যাক। 'ভালবাসা ভালবাসা', 'দুজনে', 'অমানুষ', 'ওয়ান্টেড', 'জোশ', শ্রাবন্তী ফের হিট নায়িকার আসনে। মোচার ঘণ্ট, শুক্তো, মৌরলার ঝাল রান্না করে স্বামীকে খাইয়ে ফ্লোরে গিয়ে shot দিচ্ছে দেব, জিৎ, সোহমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এ মেয়েকে স্যালুট করতেই হবে আপনাকে। আড্ডা দিয়ে জানাচ্ছেন প্রীতিকণা পালরায়।

শুরুর শুরুটা কী রকম?

আমার জন্ম অমৃতসর-এ। বাবা মিলিটারিতে চাকরি করতেন। দু'বছর পর অমৃতসর থেকে আমরা চলে যাই শিলং-এ। শিলং-এ দু'বছর কাটিয়ে চার বছর বয়সে আমার কলকাতায় পা রাখা। বেহালায় পৈতৃক বাড়ি আমার। যৌথ পরিবারে কাকা, জেঠা, দাদা, দিদি, ভাই-বোনের মধ্যে বেড়ে ওঠা। দারুণ মজায় কাটিয়েছি ছোটবেলা। সারা বছরই আমাদের বাড়ি জম-জমাট। সবার ছোট বলে সবসময় favour পেয়ে এসেছি। তবে হ্যাঁ, শাসন করার scope পেলেও কেউ ছাড়ত না।

টালিগঞ্জের সঙ্গে হাত ধরাধরিটা কীভাবে হল?

আমি সারদা বিদ্যাপীঠ স্কুলে পড়তাম। নার্সারি থেকেই ওই স্কুলের ছাত্রী আমি। একবার পুজোর ছুটিতে আমার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছি। ওই বন্ধুর বাড়িতে ইন্ডাস্ট্রির একজন কেউ এসেছিলেন যিনি আমাকে দেখে বলেছিলেন অভিনয় করতে চাও? আমি বলেছিলাম জানি না। তখন ওই বন্ধুটির মা বলেছিলেন, ও তো ছোট, ও কী বলবে? ওর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কাকিমাই আমার বাড়ির নম্বর দিয়ে দিয়েছিলেন।

ব্যস, ভাব হয়ে গেল টলি-পাড়ার সঙ্গে?

হ্যাঁ। স্বপন সাহার 'মায়ার বাঁধন' ছবির কাজ চলছিল। প্রসেনজিৎ, ঋতুপর্ণা, অভিষেক, শতাব্দী cast ছিল। আমাকে ডাকা হয়েছিল প্রসেনজিৎ-এর মেয়ের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। সেটা ১৯৯৬ সাল। এরপর আরও দু-তিনটে ছবিতে শিশুশিল্পী হিসেবে কাজ করি। তারপর টেলিভিশন-এ কাজ। জন্মভূমি, রাজমহল, অন্তরালে, সাহিত্যের সেরা সময়, শুধু তোমারই জন্য পর পর সিরিয়ালে কাজ করেছি তখন।

স্কুলে অসুবিধে হত না?

না। আমার টিচাররা খুব ভালবাসতেন আমায়। শুটিং থাকলে স্কুল off হত, কিন্তু ওঁরা সাহায্য করতেন প্রচুর।

টেলিভিশন থেকে সরাসরি নায়িকার ভূমিকায়?

হ্যাঁ। সুদেষ্ণাদি-রানাদার সঙ্গে তখন 'অহঙ্কার'-এ কাজ করছি। পাশাপাশি কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শুধু তোমারই জন্য' সিরিজের একটা কাজ চলছিল। সুদেষ্ণাদিই একদিন ফোন করে বলল, মণি-শ্রীকান্ত তোর খোঁজ করছিল। তুই একটু ফোন করিস। তখন ক্লাস টেন চলছে আমার। করছি করবো করে ফোনটা করা হয়নি আমার। ক'দিন পর আবার সুদেষ্ণাদির ফোন। এবার বকা। কী রে, এখনও ফোন করিসনি? ওরা আমাকে phone করছে। বকা খেয়ে তখন ফোন করলাম। ওঁরা পরদিনই আমাকে দেখা করতে বললেন।

ব্যস, যাত্রা শুরু?

হ্যাঁ। পরদিন গিয়ে দেখি জিৎ ওখানে বসে। জিৎ তখন hero। 'সাথী' সুপারহিট। রবিজীকে প্রথম দেখলাম। রবি কিনাগি। একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম ওঁরা সকলেই বেশ down to earth। পরদিনই photo shoot-এ ডাকলেন। আমি ভেবেছিলাম জিৎ-এর বোন টোন-এর চরিত্র দেবে। তারপর শুনি জিৎ-এর হিরোইন। বিশ্বাস করতে পারিনি জানেন? সেই শুরু হল 'চ্যাম্পিয়ন'-এর কাজ। সেটা ২০০৩ সাল।

প্রথম ছবিই হিট?

হলে কী হবে? তার মধ্যেই তো বিয়ে করে ফেললাম। বিয়ের পরের বছরই ছেলে হল। টুয়েলভে ক্লাস করতে গেছি ছেলেকে মায়ের কাছে রেখে। এরপর পাঁচ বছরের gap। ২০০৭-এর নভেম্বরে আবার রাজীব বলল, তুমি কি comeback করবে? রাজীব তখন ছবি করার কথা ভাবছে। আর ছেলেও একটু বড় হয়ে গেছে। ভাবলাম মন্দ কী? কিন্তু তখন আমি সাংঘাতিক মোটা হয়ে গেছি। প্রায় সত্তর কেজি ওয়েট। কিন্তু যেই ঠিক করলাম আবার ফিরব পর্দায়, বাড়িতেই শুরু করলাম প্রস্তুতি।

কী রকম?

সারাদিন ফ্রি-হ্যান্ড করতাম। বিশ্বাস করবেন না, ঘুমোনোর আর খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া বসতাম না। জল খেতাম প্রচুর। আর

আমি ভেবেছিলাম জিৎ-এর বোন টোন-এর চরিত্র দেবে। তারপর শুনি জিৎ-এর হিরোইন। বিশ্বাস করতে পারিনি জানেন? সেই শুরু হল 'চ্যাম্পিয়ন'-এর কাজ। সেটা ২০০৩ সাল।

এক্সারসাইজ করতাম। খাওয়া বলতে ছিল টক দই, খোসা শুদ্ধু শসা, সবজি সেদ্ধ আর মাঝে মধ্যে চিকেন স্টু। দু'মাসে নিজেই সত্তর থেকে আটান্নয় নামলাম। এরপর রবিজীর সঙ্গে যোগাযোগ করি। অশোক ধানুকার অফিসে গেলাম দেখা করতে। অদ্ভুৎ কাকতালীয় ব্যাপার। তখন রবিজীও নতুন ছবির কাজ শুরু করছেন। ওই আটান্ন কেজি দেখেও রবিজী আঁতকে উঠলেন, VLCC join করলাম। দেড় মাসে কমালাম আরও আট কেজি।

এ তো অবিশ্বাস্য! দেখে তো বোঝা যায় না ভেতরে এত আগুন?

(হেসে) আসলে আমি Leo তো। ভীষণ জেদি। যেটা করব মনে করি, করেই ছাড়ি।

বাংলা ছবি এখন তারুণ্যে ভরপুর। জিৎ, দেব, যিশু, সোহম, রাহুল ওদিকে কোয়েল, শুভশ্রী, পায়েল, প্রিয়াঙ্কা, তুমি। বাকিদের কাকে কেমন লাগে?

নায়ক হিসেবে জিৎদা ফাটাফাটি। presence-এর মধ্যেই একটা hero hero ব্যাপার আছে। দেবও দারুণ। ওর সঙ্গে তো সারাক্ষণ ঝগড়া হয় আমার। বিট্টু মানে সোহমেরও acting দারুণ। ওর সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে অনেককিছু শিখেছি। নায়িকাদের মধ্যে কোয়েলদি আমার দারুণ বন্ধু। শুভশ্রীও তাই। পায়েলের acting আমার ভাল লাগে। ওর মধ্যে একটা inocence আছে। প্রিয়াঙ্কাকেও মিষ্টি লাগে।

হাতে এখন কী কী কাজ?

সুজিত মণ্ডলের ছবির কাজ চলছে। আমি আর দেব আছি। এর পরের ছবি আবার রবিজীর। আমি আর জিৎদা।

রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে ছবি করার ইচ্ছে নেই?

ভীষণ। কিন্তু রাজদার সঙ্গে আমার কী যে হয়। বারবার date clash করে।

অফার ছিল নাকি?

হ্যাঁ তো। 'চ্যালেঞ্জ'-এর জন্য বলেছিল। কিন্তু তখন আমার 'দুজনে'-এর কাজ চলছিল।

শুটিং ছাড়া কী করো?

একদম বাড়িতে। ছেলের সঙ্গে খেলা করি। বরের জন্য রান্না করি। রাজীব বাড়ির রান্না ছাড়া খায় না। আর আমার হাতের রান্না ওর দারুণ favourite।

বলো কী! তুমি বাড়িতে রেগুলার রান্না করো?

হ্যাঁ। শুটিং-এ যাওয়ার আগে বা ফিরে এসে। আমি সবরকম বাঙালি রান্না পারি। মা ঠাকুমাদের হার মানিয়ে দেবো। শুক্তো, মোচাঘণ্ট, ঝিঙে পোস্ত, ওলের ডালনা, আমিষ তো সবরকম। আর হ্যাঁ, অসম্ভব ঝাল খাই আমি।

যাক। এবার বলো, পুজোর প্ল্যানিং কী?

একদম ছুটি। রাজীব আর আমি দু'জনেই কোনও কাজ রাখবো না। গতবছর পুজোর সময় 'দুজনে'-র প্রিমিয়ার ছিল আমেরিকায়। তাই পুজোটা ভেস্তে ছিল। এবার উশুল করে নেবো। প্রচুর খাব। আর সব ডায়েট ওই ক'দিনের জন্য ভুলে যাব।

ঠাকুর দেখতে বেরোবে না?

না সেটা আর সম্ভব হয় না। তবে shopping করব প্রচুর।

তার মানে দারুণ enjoy করছ এই 'কাম ব্যাক' পর্ব?

সত্যি। তবে নিজের পরিশ্রমের কথা তো বললাম। যেটা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তা হল পরিবারের সকলের সহযোগিতার কথা। আমার শাশুড়ি থেকে আমার বাবা-মা-দিদি-রাজীব সবাই যে কীভাবে পাশে থেকেছে ভাবতে পারবেন না। ফ্যামিলি সাপোর্ট-এর জন্যই শ্রাবন্তীর 'কাম ব্যাক' সম্ভব হয়েছে।

ইতি অনুকরণ

সুদেষ্ণা রায়

রিচা মাকে বুঝতেই পারে না। সেই কবে, প্রায় ১৮ বছর আগে বাবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় মার। কিন্তু আজও মা ভুলতে পারেনি বিচ্ছেদের অপমান। রিচা তখন এক বছরের। বাবাকে রিচার মনেই নেই। কারণ রিচা হওয়ার আগে থেকেই বাবা-মার ঝগড়া শুরু হয়। রিচা হওয়ার পর মা বাপের বাড়ি থেকে আর ফেরেনি। বাবা এসেছিল নাকি দু'একবার ছোট্ট রিচাকে দেখতে। কিন্তু তখন রিচা কত হবে মাস ছয়েকের, তার বেশি নয়। বিচ্ছেদের পর মা, বাবার সব চিহ্ন জীবন থেকে মুছে ফেলে। তাই রিচা জানেই না বাবাকে কেমন দেখতে। কোথায় আছে তার বাবা তাও রিচার জানা নেই। শুনেছে ক্যানাডা না ইউএসএ কোথায় যেন চলে গেছেন।

যাকগে, এই ১৮ বছরে মা কিন্তু রিচাকে সব দিয়েছেন। ভালবাসা, নিরাপত্তা, সঙ্গ। সব। সমিতা নিজের জীবনটা আবার গড়ে তুলেছেন, বিচ্ছেদের ভগ্নস্তূপ থেকে। একটি অ্যাড এজেন্সিতে কপি রাইটার হয়ে কাজ শুরু করে আজ এজেন্সির ক্রিয়েটিভ হেড সমিতা। ওঁর লেখা কপি বা ওঁর কনসেপ্ট-এ তৈরি বিজ্ঞাপন বেশ কিছু অ্যাওয়ার্ড-ও জিতেছে। সমিতা ক্রিয়েটিভ জগতে নামও করেছে। গত বছর একটা অ্যাড ফিল্মও ডিরেক্ট করেছে সমিতা। সম্প্রতি একটা ফিল্ম করবে বলে চিত্রনাট্য-ও লিখছেন। এ ব্যাপারে সমিতা প্রায়ই মেয়ে রিচা ও রিচার বন্ধু সায়কের সঙ্গে আলোচনা করেন। সায়ককে সমিতার পছন্দ। কারণ সায়কের মধ্যে রয়েছে একটা স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়েটিভিটি। সায়ক আর রিচা দু'জনেই ইংরিজি অনার্স নিয়ে পড়ছে। সেকন্ড ইয়ারে। গত দু সেমেস্টারের প্রথমটায় রিচা, দ্বিতীয়টায় সায়ক টপ করেছিল ক্লাসে। এবার চলছে প্রতিযোগিতা, থার্ড সেমেস্টারে কে জেতে তার। আর এই কম্পিটিশন করতে করতে কখন যে রিচা আর সায়ক একে অপরকে ভালবেসে ফেলেছে, তা ওরা বলতে পারে না। কিন্তু সে ভালবাসার কথা এখনও মাকে বলে উঠতে পারেনি রিচা। কী করে বলবে? মা আর বাবারও তো প্রেম কলেজে। তারপর বিয়ে। আর বিয়ের এক বছরের মধ্যেই শুরু সমস্যা।

'আমি তোমাকে সব স্বাধীনতা দিচ্ছি রিচা, কিন্তু তোমাকেও এর মর্যাদা দিতে হবে। তোমাকে প্রমিস করতে হবে তুমি সমবয়সী ক্লাস মেট-এর সঙ্গে প্রেম করবে না। সেই প্রেম লাস্ট করে না।'

'এটা তোর মার একেবারে ইললজিকাল কথা। ওঁর জীবনে ওটা সত্যি বলে, আমাদেরও...'

'আই নো, কিন্তু মাকে লেট ডাউন আমি করতে পারব না। মা একা, সিঙ্গল হ্যান্ডেডলি আমাকে মানুষ করেছে। সব দিয়েছে।'...

'কিন্তু রি, আমার বাবা তো বলে, অভিভাবকদের কখনও নিজের চিন্তা, নিজের অভিজ্ঞতাগুলো ছেলেমেয়ের ঘাড়ে চাপানো উচিত নয়। আমার বাবা মারও তো ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় সো ওয়াট?'

'কিন্তু তোর বাবা মা তো কলেজে একসঙ্গে পড়েননি, প্রেম করেননি...'

'না তা নয়, তবে বাবা যখন মার প্রেমে পড়ে তখন বাবা ওয়াজ ম্যারেড, কিন্তু বাবার প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না। বাবা তাঁর সঙ্গে ডিভোর্স-এর পর মাকে বিয়ে করেন। ইনফ্যাক্ট, আমি তো শুনেছি, আমার মা বিয়ের আগেই কনসিভ করেন, এমনকি বাবার ডিভোর্স চলাকালীনই আমি হই।'

'দ্যাট ওয়াজ নট রাইট। আমার মা তো এটা জানলে আরও খচে যাবে।'

'কেন? আমাকে জারজ ভাববেন? না, আমি জারজ নই। আমার বাবা মা ঠিক ঠাক বিয়ে থা করেছিলেন। তারপরও বিয়েটা ভেঙে যায়। কিন্তু বাবা কখনও বিটার নন। মা ইউ এস-এ থেকে যেতে চেয়েছিলেন, বাবা ফেরত এলেন আমাকে নিয়ে।'

'তোর বাবার কেস আর আমার মার কেস এক নয়। বাবা চলে যাওয়ার পর মা কখনও কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক গড়ে তোলেননি। মা মনে করেন বিয়েটা খুব পবিত্র একটা সম্পর্ক যা ভালবাসার উপর গড়ে ওঠে। তাই মা চায় না, আমি কলেজে প্রেম করি। মা ফিলস, আরও ম্যাচিওর্ড হয়ে ম্যাচিওর্ড প্রেম করা উচিত।'

'উচিত অনুচিত দিয়ে তো প্রেম হয় না। তুই আমাকে ভালবাসিস এটা তো ফ্যাক্ট?'

'হ্যাঁ'

'তাহলে?'

কোনও উত্তর নেই রিচার।

এদিকে সমিতার মুড অফ। অফিসে নতুন এক আর্ট ডিরেক্টর জয়েন করেছে, অসম্ভব ক্রিয়েটিভ, কিন্তু খুব বিশৃঙ্খল। সমিতা অফিসে টাইমিং, পরিচ্ছন্নতা, পার্সোনাল অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে খুবই সতর্ক। আর 'জে' মানে জয়ন্ত এসবের ধার ধারে না। ওর ডেস্কটা দেখলে মনে হয় তার মধ্যে হাতি ঢুকে বসে থাকলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন কম্পিউটার-এর যুগে ডেস্কে অত কাগজ, বই, জিনিস অসহ্য। তার উপর আবার টাইম জ্ঞান বলে কিছু নেই জয়ন্তর। আজই তো সকালে একটা ডিজাইন হ্যান্ডওভার করার কথা, দিচ্ছি দেব করে দুপুর গড়িয়ে গেল। সমিতা ওর ঘরে গিয়ে দেখে কম্পিউটারে গেমস খেলছে 'জে'। রেগে চার পাঁচটা কটু কথা বলে দিল ওকে।

কিছুক্ষণ বাদে সিডি হাতে নিজেই এল ওর ঘরে। সিডিটা দিয়ে বলল,

'আপনার প্রবলেমটা কোথায় জানেন, আপনি আগেই সব ভেবে বসে থাকেন। লাঞ্চ ব্রেকে রিল্যাক্স করছিলাম, আপনি ধরে নিলেন আমি কাজ না করে খেলছি। এই নিন সিডিতে সবটা

ট্রান্সফার করে দিয়েছি, ফিনিশিং হয়ে গেছে, চেক করে প্রিন্ট করতে দিন। আর শুনুন অত চাপ নেবেন না। চাপ দেবেন, আমার ছেলের অ্যাডভাইস।'

সমিতা কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই ঘর ছেড়ে চলে যায় 'জে'। ডিজাইন-এর সিডি খুলে দেখে সত্যিই লে-আউট লা জবাব।

আজ মাকে বলতে হবে রিচার। পুজোর ছুটিতে সায়কের গ্রামের বাড়িতে ওরা সবাই মিলে যাবে। মা যেতে দেবে তো! যতদুর শুনেছিল মার কাছে, মা আর বাবাও নাকি একটা পুজোয় কোথায় বেড়াতে গিয়ে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কে জানে মা রাজি হবে কিনা!

রিচার প্রস্তাব শুনেই ছ্যাঁৎ করে উঠল সমিতার মন। তখন সমিতার বয়সও ১৯ হবে। তারকেশ্বরের কাছে সেই গ্রাম। চারিদিকে কাশফুলের বন। তারই মাঝে ঘুরতে ঘুরতে 'ও' হঠাৎ কাছে টেনে নেয় সমিতাকে।

'শরতের আকাশ আর এই কাশফুল কে সাক্ষী রেখে বলছি, তোমাকে ভালবাসি।'

সমিতা আর সে ভেসে গিয়েছিল আবেগে। এর পরের বছর পাশ করেই ও কাজ নিল। সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে, আর বিয়ের এক বছর পরই সমস্যা। সমস্যা সমাধানের জন্যই সমিতা পিল খাওয়া বন্ধ করে ইচ্ছে করে সন্তান সম্ভবা হয়। কিন্তু রিচাও জোড়া দিতে পারেনি ওদের ভাঙা সম্পর্ক।

'মা সায়কের বাবা বলেছেন উনি পার্সোনালি এসে তোমাকে আর আমাকে দু'জনকে ইনভাইট করবেন ওদের গ্রামের বাড়িতে যেতে। সায়ক পঞ্চমীর দিন ওর বাবাকে নিয়ে আসবে। ষষ্ঠীর দিন ভোরে বেরবো।'

এ আবার এক উটকো ঝামেলা। এই বয়সে পুজোর সময় মেয়ে পাহারা দিতে মেয়ের বন্ধুর বাড়ি যাওয়া। এটা ঠিক নয়। 'আসুক সায়কের বাবা, দেখি একটা এক্সকিউজ খাড়া করা যায় কি না', মনে মনে ভাবে সমিতা।

'তোর বাবা পারবেন তো মাকে কনভিন্স করতে।'

'রিচা, তুই বাবাকে চিনিস না, বাবা পারে না এমন জিনিস নেই। বাবা বলে, জীবনটা খুব ছোট। তাই এনজয় ইট। খারাপ ঘটনাগুলো ভুলে শুধু ভালগুলো ভেবে এগিয়ে চলো।'

'কিন্তু, সবসময় তো দুঃখ ভোলা যায় না। এই ধর তোকে আমি এত ভালবাসি, তুই যদি এখন আমাকে ছেড়ে আর কারও প্রেমে পড়িস, আমার পক্ষে সেটা খুব ট্র্যাজিক হবে।'

'তা হতে পারে, কিন্তু, আমি তোকে ছেড়ে যেতে পারি, এটা ভেবে এখন থেকে টেনশন করে কোনও লাভ আছে? যা হয়ে গেছে, বা যা হতে পারে, এটা নিয়ে না ভেবে, এখন যেটা ভাল হচ্ছে সেটা নিয়ে ভাব। আয় কাছে আয়।' রিচা এগিয়ে যায়, চোখ বন্ধ করে মুখটা মেলে দেয়। সায়ক ওর কপালে একটা ছোট চুমু দিয়ে বলে, 'আই লাভ ইউ। এখন টেনশন করিস না। বাবা তোর মাকে কনভিন্স করেই ছাড়বে।'

আজ পঞ্চমী। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরতে চায়

সমিতা। কাল থেকে পাঁচ দিনের ছুটি। ভেবেছিল, বাড়িটা একটু পরিষ্কার করবে, মেয়েকে ভালমন্দ রান্না করে খাওয়াবে। একটা ফিল্ম দেখবে, বা ডিভিডি এনে মা-মেয়ে মিলে একসঙ্গে যে ছবিগুলো দেখা হয়নি সেগুলো দেখবে। কিন্তু রিচা এখন কী যে বায়না ধরেছে সায়কের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার! আজ আবার সায়কের বাবা আসবেন।...

'এই যে ম্যাডাম, তাড়াতাড়ি এই পি ও পি গুলোর ডিজাইনটা দেখে নিন, আমি ছেড়ে দিতে চাই, আই হ্যাভ টু লিভ আর্লি।'

জয়ন্তর কথা বলার ভঙ্গিতে গা পিত্তি জ্বলে গেল সমিতার।

'আপনার তাড়া আছে বলে, আমার পক্ষে কাজে গাফিলতি করা সম্ভব নয়। প্লিজ ডিজাইনগুলো রাখুন। আমি সময়মতো দেখে জানাচ্ছি।'

জে কিছু বলতে যাচ্ছিল, না বলে চলে যায়। সমিতা ডিজাইনগুলো দেখতে গিয়েও দেখে না। ফোন তুলে বাড়ির কাছের ফুড ডেলিভিারি কাউন্টার থেকে কিছু স্ন্যাক্স অর্ডার দেয়। তারপর রিচাকে ফোন করে বলে, ও যেন বাড়িতে ঠিক সময়মতো পৌঁছে যায়। 'আমার অল্প লেট হতে পারে, ওরা এলে চা-কফি আর স্ন্যাক্স দিস...'

'একি আপনি ফোনে চা-কফির অর্ডার দিচ্ছেন, ডিজাইনগুলো দেখেছেন...'

ফোন নামিয়ে ফোঁস করে ওঠে সমিতা।

'প্লিজ, আমার ঘরে ঢোকার আগে নক করবেন, আর আমি কী অর্ডার দিচ্ছি না দিচ্ছি সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি ডিজাইনগুলো দেখে ডাকব আপনাকে তখন আসবেন, ওকে?'

জয়ন্ত আবার কী যেন বলবে ভেবেও বেরিয়ে যায়। সমিতার মাথাটা দপদপ করছে। 'পুরুষমানুষ সত্যি স্বার্থপর। শুধু নিজেরটুকু দেখে। আজ ওর তাড়া বলে ডিজাইনগুলো এনে বারবার বলছে। আর আমি বললে? না, দেখব না এখন।' কেমন বাচ্চাদের মতো প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠল সমিতার। একেবারে বিকেল পাঁচটার সময় ডিজাইনগুলো ওকে করে ডাকল জয়ন্তকে। দু'একটা চেঞ্জ বলে দিল। জয়ন্ত আর্ট ওয়ার্ক নিয়ে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

আধঘণ্টা পর যখন অফিস ছাড়ল সমিতা, তখনও দেখল জয়ন্ত কাজ করছে। বেশ হয়েছে...

রাস্তায় পঞ্চমীতেই কী ভীড়। বালিগঞ্জের অফিস থেকে গোলপার্ক হয়ে ঢাকুরিয়া ব্রিজ, যোধপুর পার্ক। ফাঁকা থাকলে গাড়িতে দশ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। কিন্তু গোলপার্ক থেকে যোধপুর পার্ক পৌঁছতে লাগল পাক্কা আধঘণ্টা।

রিচা, সায়ক অনেক আগেই পৌঁছে গেছে। সমিতা এসে গা ধুয়ে, চেঞ্জ করে ওদের সঙ্গে যখন বসল তখন বাজে সাতটা।

'বাবা কেন যে দেরি করছে, কে জানে? এমনকি ফোনটাও বন্ধ করে রেখেছে। মাসি প্লিজ এর জন্য তুমি কিন্তু কালকের যাওয়াটাতে না করো না। তুমিও এনজয় করবে। আমাদের বাড়ির পুজোটা খুব ট্র্যাডিশনাল। মনে হবে অন্য জগতে পৌঁছে গেছ...'

ঠিক একই কথা বলেছিল ও। কথাটা সত্যিও। ওদের গ্রামের সবুজ ক্ষেত, কাশফুল, নদী, সব মিলিয়ে ওটা ছিল অন্য জগৎ। আর সেই জগতেই ওরা চলে গিয়েছিল...

দরজায় বেল। শুনেই লাফিয়ে উঠে দরজা খুলতে গেল রিচা। সঙ্গে সায়ক।

'আসুন, আসুন কাকু। না চিন্তা করবেন না, যা জ্যাম রাস্তায়, আসুন...'

ঘরে ঢুকল রিচা, সায়ক, আর সায়কের বাবা। হাসি হাসি মুখে উঠে দাঁড়িয়ে হাসিটা মিলিয়ে গেল সমিতার মুখে...সায়কের

আপনি আমার উপর প্রতিশোধ নিতে নিজের মেয়ের পুজোর আনন্দটা মাটি করছেন। এনিওয়ে কাল সকাল ছ'টায় আমি আর সায়ক আসব। শেষ বারের মতো বলছি, প্লিজ আসুন। কাল না এলে বুঝব আপনি বাচ্চাই রয়ে গেলেন।

বাবাও এক মুহূর্ত স্তম্ভিত। তারপরই টাল সামলে বলে উঠল...

'ওয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ।'

সারপ্রাইজ তো অবশ্যই, কিন্তু সেটা প্লেজান্ট কিনা কে জানে! সায়কের বাবা যে জয়ন্ত হবে সেটা স্বপ্নেও, থুড়ি দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি সমিতা।

যাই হোক বেশ ভদ্রভাবেই জয়ন্ত আমন্ত্রণ জানালেন রিচা ও সমিতাকে দেশের বাড়ি যেতে। কিন্তু সমিতার মধ্যে সেই দুপুরের শিশুসুলভ জেদ চেপে বসল। রাজি হলেন না। শেষে জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি আমার উপর প্রতিশোধ নিতে নিজের মেয়ের পুজোর আনন্দটা মাটি করছেন। এনিওয়ে কাল সকাল ছ'টায় আমি আর সায়ক আসব। শেষ বারের মতো বলছি, প্লিজ আসুন। কাল সকালে না এলে জানব, আপনি বাচ্চাই রয়ে গেলেন, বড় হলেন না।'

সায়ক আর জয়ন্ত চলে যেতে, রিচা এসে দেখে সমিতা কাঁদছে।

'আমি সত্যিই খুব খারাপ মা! কী করব বল রিচা। তুই তো জানিস বাবা-মা দুটোই আমি হতে চেয়েছি। আমি চাই না তোর জীবনে আমার মতো কোনও কষ্ট নেমে আসে। আমি তোকে ভালবাসি, তুই-ই তো আমার সব। রাগ করিস না, ...' আর বলতে পারে না সমিতা। কেঁদে ফেলে অঝোরে।

রিচা জড়িয়ে ধরে মাকে। মা কাঁদুক। 'আমিও তোমাকে ভালবাসি মা। কিন্তু সায়ককেও ভালবাসি। তুমি বারণ করা সত্ত্বেও ক্লাসমেটকে ভালবেসে ফেলেছি, কী করব আমি যে তোমার মেয়ে। তোমাকে ভালবাসি। তুমি না চাইলে যাব না আমরা। আমার কষ্ট হলেও, মন খারাপ হলেও, পুজোর সময় তোমার মন খারাপ আমার সহ্য হবে না মা।'

মা ও মেয়ে কেঁদেই চলে।

সকাল ছ'টা। জয়ন্তর বড় গাড়িটা এসে হাজির সমিতার বাড়ির নিচে। হর্ন বাজায় তিনবার। বারান্দায় কেউ নেই। দরজাও খোলে না। সায়ক গাড়ি থেকে নামতে যায়। হাত চেপে ধরে জয়ন্ত। সায়ক ঘোরে। জয়ন্ত বলে, 'না জোরাজুরি নয়, আসতে হলে হর্ন-এই আসবে।'

'বাবা আরেকবার হর্ন দাও।' জয়ন্ত মাথা নাড়ে। সায়ক বাবার হাত ছাড়িয়ে হর্নে হাত দিয়ে চেপে ধরে। হর্নের আওয়াজে একটা দু'টো করে জানলায় পাড়ার অন্যান্য লোক এসে দাঁড়ায়। হর্ন বেজে চলে। হট করে দরজা খুলে যায় সমিতার বাড়ি। সমিতা বেরিয়ে আসে। এগিয়ে যায় গাড়ির দিকে। সায়ক হর্ন ছেড়ে বলে, 'সরি'। 'সরি তো হওয়াই উচিত। দু'জন পুরুষ মানুষ গাড়িতে বসে আছ। হর্ন বাজিয়ে পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙাচ্ছ। যাও সায়ক, রিচাকে হেল্প করো। ব্রেকফাস্টটা আনতে যাও।'

সায়ক নেমে পড়ে। ফ্রন্ট সিট-এ জয়ন্তর পাশে বসে সমিতা।

'জোরে চালাবেন না কিন্তু...'

জয়ন্ত কিছু বলে না। শুধু হাসে।

ডেকরেটিভ ট্রে আর দিয়া

পুজোর মরসুমে উপহার দেওয়া-নেওয়া চলে সব বাড়িতেই। কেমন হবে বলুন তো যদি সেসব উপহার আপনি নিজের হাতে তৈরি করে দেন। আপনাকে সাহায্য করছেন যূথিকা দত্ত।

ডেকরেটিভ ট্রে

কী কী লাগবে

ঘাস বোর্ড, রঙিন যে কোনও কাগজ অথবা হ্যান্ডমেড পেপার, কাঁচি, আঠা, ফ্লেক্সিবল পাইপ, এনামেল কালার (গোল্ডেন, সিলভার ইত্যাদি) জরির লেস, জরির ফুল অথবা স্যাটিন কাপড়ের ফুল।

দাম

ঘাস বোর্ড : ১০টাকা স্কোয়্যার ফুট ;
ফ্লেক্সিবল পাইপ : ৪টাকা ফুট ;
এনামেল কালার : ২০ টাকা কৌটো ;
কাগজ : এমনি পেপার হলে ৩ থেকে ৭ টাকা, হ্যান্ডমেড পেপার হলে ২২-১৫ টাকা ;
জরির ফুল অথবা কাপড়ের ফুল : ১০-১৫ টাকা প্যাকেট।

কাঁচামাল কোথায় পাবেন

ঘাস বোর্ড আপনার এলাকায় যে কোনও প্লাইউড সেন্টারে পেয়ে যাবেন। ফ্লেক্সিবল পাইপ এবং এনামেল কালার হার্ডওয়্যারের দোকানে পেয়ে যাবেন। এমনি কাগজ হলে এলাকার যে কোনও পেপার হাউসে পাবেন। হ্যান্ডমেড পেপারও এক দু পিস হলে পেপার হাউসে পেয়ে যাবেন। যদিও শিয়ালদহের বৈঠক খানা মার্কেট হল পেপারের পাইকারি বাজার। জরির লেস, এবং জরির ফুল এলাকার দোকানে পাবেন অথবা বড় বাজারের খ্যাংড়া পট্টিতে পেয়ে যাবেন।

কী করে বানাবেন

ট্রে-টি আপনি গোল, ওভাল, স্কোয়ার, পানের মতো শেপ— যেমন খুশি বানাতে পারেন। আপনি যে শেপের ট্রে বানাবেন সেই শেপ অনুযায়ী নিজেও হ্যাক্সো দিয়ে কেটে নিতে পারেন অথবা দোকান থেকেও কাটিয়ে আনতে পারেন। বোর্ডটি কাগজ দিয়ে আঠার সাহায্যে ঢেকে দিন। যে কালারের পেপার লাগালেন তার সঙ্গে ম্যাচ করে পাইপটি কালার করে নিন অথবা জরি, চুমকির লেস পাইপটিতে আঠা দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে নিন। যাতে পাইপটি না দেখা যায়। এরপর পাইপটি বোর্ডের চারধারে লাগিয়ে দিন, ডেনড্রাইটের সাহায্যে কয়েকটা আলপিন চারিদিকে আটকে দিন। আপনার ট্রে তৈরি। আপনি আপনার মনের মতো রঙ ও চুমকি দিয়ে সাজান। পাইপটির ওপরে আঠা ও আলপিন দিয়ে ছোট ছোট ফুলগুলিকে আটকে দিন। আরও সুন্দর করার জন্য ট্রের বাইরের দিকটিতে অর্থাৎ বোর্ড এবং পাইপ এই দু'টির মাঝখানে যে গ্যাপ রয়েছে সেটিকে মানানসই লেস দিয়ে ঢেকে দিন।

ডেকোরেটিভ দিয়া

কী লাগবে

মাটির প্রদীপ, স্টোন, চুমকি, ও 3D আউট লাইনার এবং মাটির রং।

দাম

মাটির প্রদীপ ২টাকা থেকে ৭৫-৮০ টাকা, স্টোন ৫-১০টাকা, 3D আউটলাইনার ১৮ টাকা।

কাঁচামাল কোথায় পাবেন

কুমোরটুলিতে মাটির প্রদীপ পাইকারি হারে পাবেন, স্টোন, চুমকি ও 3D আউটলাইনার আপনার এলাকার পেপারের দোকানে পেয়ে যাবেন অথবা কুমোরটুলি কিংবা কালীঘাটে পাবেন।

কী করে বানাবেন

কুমোরটুলিতে কালার করা প্রদীপ পেয়ে যাবেন। যদি কালার ছাড়া প্রদীপ আনেন তাহলে আপনি অল্প রঙের টাচ দিয়ে নেবেন মাটির রং দিয়ে। রঙের সঙ্গে একটু ফেভিকল মিশিয়ে নেবেন তাতে রঙটা পাকা হবে। রঙ শুকিয়ে গেলে স্টোন, চুমকি, গ্লিটার দিয়ে আপনি আপনার মনের মতো করে সাজান। ২টাকার মাটির প্রদীপই সামান্য স্টোন, চুমকি বা গ্লিটারের ছোঁয়ায় অসাধারণ হয়ে উঠবে।

'দুই পৃথিবী' ছবিতে কোয়েল, জিৎ, দেব ও বরখা

পুজোর ছবি, ছবির পুজো!

পুজোয় বাঙালি ফিল্ম-এর জগৎ থেকে কী আশা করতে পারেন, তারই তালিকা রইল। লিখেছেন মেঘ গুপ্ত

এবার পুজোয় বাংলা ছবির বাজারে সেরা আকর্ষণ অবশ্যই 'দুই পৃথিবী'। একেবারে ত্রহ্যস্পর্শ যোগ, জিৎ-দেব এই প্রথম একসঙ্গে তার ওপর ছবির পরিচালক রাজ চক্রবর্তী। এ ছবি ওভার বাউন্ডারি না মেরে যায়। 'লে ছক্কা'-র পর আবার ছক্কা। বাজারে খবর, পুজোর মধ্যেই সারা বাংলা কাঁপিয়ে আড়াই'শটি হলে মুক্তি পেতে চলেছে ভেঙ্কটেশ ফিল্মস্-এর এই নতুন ছবি। নায়িকা কে? কে আবার, বর্তমানে সেরা নায়িকা কোয়েল মল্লিক। বাংলা বাণিজ্যিক ছবির সব সেরাদের মিলনে নতুন ধারার বাংলা ছবি কতটা বাণিজ্য করতে পারে দেখতে হবে এবার। ছবিতে নায়িকা কোয়েল ডাক্তার। যাকে একবার দেখেই প্রেমে পড়েছে বড়লোকের ছেলে জিৎ, আর দেবের চরিত্রটা এ ছবিতে কি জানেন? এ ছবিতে তিনি বাইকচোর। এক একটা এক্সাইটিং ঘটনার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে 'দুই পৃথিবী'-র এক্সাইটিং প্লট। আর একটি এক্সাইটিং ব্যাপার আছে এ ছবিতে। মুম্বইয়ের টিভি অভিনেত্রী বরখা বিস্ত-র পাগল করা আইটেম ডান্স। দর্শক এক্সাইটমেন্ট নিয়ে বসে আছে ছবি দেখার আশায়।

মূলধারার ছবির পাশে আছে এক নতুন পরিচালকের নতুন ছবি, 'অটোগ্রাফ'। টিভির পর্দায় শুরু হয়ে গেছে এ ছবির বিজ্ঞাপন। দেখেই বোঝা যায় পরিচালক শ্রীজিৎ মুখোপাধ্যায় একটা স্মার্ট ছবি আমাদের উপহার দিতে চলেছেন। পরিচালক নতুন হলেও ছবির নায়ক কিন্তু আমাদের চির পরিচিত বুম্বাদা। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' এর ছাঁদে এক সুপার্ব হিরোর মন-বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীজিৎ, নায়ক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। ছবির পোস্টার ও প্রোমোতে নতুন গেট আপে কী ড্যাশিং দেখাচ্ছে ওঁকে, তা তো সবাই দেখে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। সঙ্গে রয়েছেন ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত। হিন্দি সিরিয়ালের পর্দা থেকে এসে এর মধ্যেই কিন্তু ইন্দ্রনীল বেশ ক'টি বাংলা ছবি করে ফেলেছেন। ছবিগুলিতে ওঁর কাজও দর্শকের ভাল লাগছে। অমর্ত্য সেনের কন্যা নন্দনা 'অটোগ্রাফ'-এ নায়িকার ভূমিকায়। দেশি-বিদেশি ছবি করার ফাঁকে সময় করে বাংলা ছবি করতে

হিরণ ও প্রসেনজিৎ

এসেছেন, দেখে উৎসাহ পাওয়া যায়। দেবজ্যোতি মিশ্রের সুরে ছবির গানগুলোর মধ্যে একটা মায়াময় আকর্ষণ লুকিয়ে আছে। কথা-সুরগুলো দীর্ঘক্ষণ মনের মধ্যে রেশ রেখে যায়।

এবার পুজোর খানিক আগেই পুজো-পুজো রব তুলতে রিলিজ হচ্ছে 'প্রেম বাই চান্স'। সদ্য 'বোমকেশ বক্সী'-র ধুতি পাঞ্জাবি ছেড়ে আবীর চট্টোপাধ্যায় জিন্স আর টি-শার্টের ওপর জামা গলিয়ে মাথায় লাল টিপ লাগিয়ে 'লোটকে দেব সটকে দেব...' গানের সঙ্গে নাচতে শুরু করলেন সঙ্গে কোয়েলকে নিয়ে। এ যেন ইমেজের সমুদ্র-পরিবর্তন। সে যাই হোক পরিবর্তনটা ভাল হল কি? সে উত্তর তো এখনই ঠিক দিতে পারব না। দর্শক কী বলে, সেটাই তো শেষ কথা। 'ক্রস কানেকশন'-র পর অভিজিৎ গুহ-সুদেষ্ণা রায়ের এই ছবির সঙ্গীত পরিচালক রূপঙ্কর। 'ক্রস কানেকশন'-এর নীল দত্তর গানগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল খুব, এবার গায়ক রূপঙ্কর প্রথম ছবিতে কেমন সুর দেন শুনতে হবে। জিৎ গাঙ্গুলি, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের ধারায় বাংলা গানের পালে হাওয়া লাগিয়ে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তিনি সেটাই দেখার।

'প্রেম বাই চান্স' ছবিতে আবীর ও কোয়েল

নিশ পাল সিং-র নতুন ছবি 'মনটা করে উড়ু উড়ু'তে এক নতুন রূপে নাকি আমরা পেতে চলেছি নায়ক হিরণকে। এতদিন বাড়িতে এমনি এমনি বসে ছিলেন না তিনি। জিমে গিয়ে বানিয়েছেন সিক্স প্যাক। বাংলা ছবির নায়কদের দৌড়ে তিনি আর পিছিয়ে থাকতে নারাজ। জিৎ-দেব-সোহমের পাশাপাশি সমানতালে তিনিও দৌড়তে চান। তাই রাত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম। মুম্বইয়ের দেখা-দেখি সবাই বডি বানাচ্ছে এটা সত্যিই দারুণ ব্যাপার। অভিনয়ের ধার বাড়ানোর দিকে আরও মন দিলে ভাল। একথা সব নায়কদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় চর্চায় মন না দিলে ধীরে ধীরে দর্শকদের ভালবাসাও একদিন হারাতে হবে। কারণ দিনের শেষে নায়ক একজন অভিনেতা তো বটেই। দেশের প্রায় সব জনপ্রিয় নায়কই কিন্তু উঁচু দরের অভিনেতা। এই ছবির নায়িকাও কিন্তু কোয়েল মল্লিক। চারটে ছবির মধ্যে তিনটি ছবিরই নায়িকা তিনি। তার মানে কোয়েলই কি এখন সবচেয়ে জনপ্রিয়? জনপ্রিয়তার দৌড়ে তাঁর সঙ্গেই রয়েছেন শ্রাবন্তীও। তিনিও এখন দেবের সঙ্গে ভেঙ্কটেশ ফিল্মস-এর অন্য ছবি করতে পাড়ি দিয়েছেন বিদেশে। অনেকদিন পর্দায় না দেখতে পাওয়া নায়িকা শুভশ্রীও নাকি আবার নতুন করে ফিরে আসছেন। তার মানে নতুন পুরনো মিলিয়ে একদল নায়ক-নায়িকা নিয়ে বাংলা ছবির বাজার এখন সরগরম। পুজোর আগে এবং পরে, বাজার করা, বেড়াতে যাওয়া, ঠাকুর দেখার ফাঁকে মাল্টিপ্লেক্স বা সিঙ্গল স্ক্রিনে কত দর্শক টেনে আনতে পারে আমাদের এই নায়ক-নায়িকারা সেটাই দেখার।

শরীর স্বাস্থ্য

পুজো মানেই খাওয়ার উৎসব। রাত জেগে ঠাকুর দেখি বা না-ই দেখি চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র স্বাদ নেওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পুজোর মধ্যে খাবার খাওয়ার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে একটু বাছবিছার করতেই হবে। এ বিষয়ে সঠিক আলোকপাত করলেন কেপিসি মেডিকাল কলেজ অ্যান্ড কেপিসি হসপিটাল-এর প্রধান ডায়েটিশিয়ান রঞ্জিনী দত্ত

পুজোয় কী খাবেন কেন

স্বাভাবিকভাবে দেখতে গেলে, বলা যায় পুজোর সময় যেন একসঙ্গে পরপর ৫টা রবিবার এসে হাজির হয়। এমনিতে রবিবার মানেই আমরা একটু ভালমন্দ খাই, কখনও বেড়াতে যাই কিংবা সিনেমা দেখি। অন্য দিনের থেকে একটু আলাদাভাবে রবিবার এনজয় করি। পুজোর ক'দিন ঠিক রবিবারের মতোই আমাদের রুটিন আলাদা হয়। আর পুজোর সময় যদি সারাক্ষণ বাড়তি ক্যালরির চিন্তা করি, তাহলে তো পুজোর আনন্দই মাটি। খাওয়া নিয়ে অহেতুক প্যানিক করা যেমন ঠিক নয়, তেমনই এমন কিছু খাবার ট্রাই করা উচিত নয়, যাতে পরবর্তী তিনমাস ধরে তার জের বয়ে বেড়াতে হয়। কাজেই খেতে হবে সবই, তবে বুঝে শুনে। এই যুক্তি প্রযোজ্য বাড়ির ছোট শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে।

কাদের জন্য কী সঠিক

পুজো কাটানোর ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ তিনটি ভাগে বিভক্ত। একদল প্যান্ডেলে ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখেন, বাইরে খান। অন্য দল ভিড় ঠেলে ঠাকুর দেখেন না, তবে রেস্তোরাঁয় খান। আর আরেক দল বাড়িতে বসে দু'বেলা ভাল মন্দ রান্না করেন, লোকজন ডেকে খাওয়ান।

প্রথমেই যেটা বলার তা হল, পুজোর সময় ডিহাইড্রেশনের সমস্যা খুব বেশি দেখা দেয়। কাজেই বাড়িতে থাকুন বা প্যান্ডেল ঘুরুন, প্রচুর জল খান। খেতে পারেন গ্রিন টি-ও। এতে শরীর শোধিত হবে। সম্ভব হলে খেতে পারেন লস্যি বা ঝোল, ফলের রসও। শিশুদেরও দিতে পারেন মিল্ক বেভারেজ। এখন অনেক ধরনের মিল্ক বেভারেজ পাওয়া যায়। যা যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর। কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন তা

যেন খুব ঠাণ্ডা না হয়। আর অবশ্যই তার এক্সপায়ারি ডেট অর্থাৎ কবে অবধি তা খাওয়া সমীচীন বোতলের গায়ে লেখা দেখে তা ঠাহর করে নেবেন।

রাত জেগে প্যান্ডেলে ঘুরলে

যাঁরা রাত জেগে শুধু প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে শুধু ঠাকুরই দেখবেন না, খাবারও খাবেন, তাঁরা যেন সতর্ক থাকেন খাবার পছন্দের ব্যাপারে। অর্থাৎ বাইরে খেলেও চাইনিজ খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। পুজোর সময় বহু রোগী হাসপাতালে আসে চাইনিজ রেস্টুরেন্ট সিনড্রোমের সমস্যা নিয়ে। চাইনিজ খাবার প্রস্তুতির পদ্ধতির জন্য যেমন এই সমস্যা হয়, তেমনই বাসি খাবার হলে তাতে বিভিন্ন ধরনের জীবানু জন্মায়, যা খেলে শরীর খারাপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাই চিনে খাবার ভাল বিশ্বাসী জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও থেকে খাবেন না। রাত জেগে ঠাকুর দেখতে হলে সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে খাবার খেয়ে নেবেন। চেষ্টা করবেন, কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার, যেমন ভাত-রুটি বেশি না খেতে। কারণ ওই খাবার প্রথমে এনার্জি লেভেল বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু দু-তিন ঘণ্টা পর থেকে সুগার লেভেল কমতে থাকে। তখনই শরীর ক্লান্ত লাগে। তাই বেরনোর আগে ডাল, মাছ, তরকারি ইত্যাদি স্বাভাবিক খাবার খাওয়া দরকার, ভাত বা রুটি, ভাজাভুজি, তেলমশলা দেওয়া খাবার কম খাবেন।

বড়দের সঙ্গে যদি ছোটরা থাকে তবে তাদের জন্য কিছু খাবার সঙ্গে রাখা উচিত। যেমন, রাখা যেতে পারে আলুর স্যান্ডউইচ। যদি নেহাতই ফুচকার বায়না করে, তবে তেঁতুল জল দিয়ে নয়, নামী দোকান থেকে দই-ফুচকা কিনে দিন। তেঁতুল জল খুব তাড়াতাড়ি রিফ্লাক্স তৈরি করে। ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে অ্যাসিডিটি মাথা চাড়া দিলে শুধু নিজের নয়, সবারই আনন্দ মাটি। চেষ্টা করবেন, হেঁটে হেঁটেই ঠাকুর দেখার। এতে মেদ বাড়ার আশংকা থাকবে না। রাস্তার পাশে গজিয়ে ওঠা দোকান থেকে এগরোল, মোগলাই না খেয়ে মিষ্টির দোকান থেকে ধোকলা বা পুরি কচুরি কিনে খান। খেতে পারেন কেক-পেস্ট্রিও। তবে পেস্ট্রিতে যেন ক্রিম কম থাকে।

প্যান্ডেলে ঘোরার সময় তেষ্টা পেলে মিনারেল ওয়াটারের বোতল কিনে নিন। খেতে পারেন কোল্ড ড্রিংক্স-ও। তবে চেষ্টা করবেন, কোলা বেভারেজ অ্যাভয়েড করতে। কোনও অবস্থাতেই বাইরের জল খাবেন না।

রেস্তোরাঁয় গিয়ে

যাঁরা রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ বা ডিনার সেরে ঘরে বসেই টিভিতে ঠাকুর ও প্যান্ডেল দেখবেন তাঁরা অর্ডার দিন ফোর কোর্স মিলের। অবশ্যই শুরু হবে স্যুপ দিয়ে। প্রথমেই স্যুপ খাওয়ার জন্য ওভার ইটিং বা বেশি খাওয়ার চান্স থাকবে না। রাতে খেতে গেলে মোগলাই বা হেভি গ্রেভিওয়ালা খাবার খাবেন না। ওই খাবার খেতে হলে দিনের বেলা খান। এতে শারীরিক সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা কম থাকবে।

বাড়িতেই থাকবেন যাঁরা

এখন বহু মহিলাই কর্মরতা। সারাবছর বাস, ট্রেন ঠেলে পুজোর ক'দিন আর ঘরের বাইরে বেরোতে চান না। তাঁরা বাড়িতেই ভাল মন্দ রান্না করেন। বাড়িতে রান্নার সময় চেষ্টা করবেন ঘিতে নয়, সাদা তেলেই যাবতীয় রান্না করার। রান্নায় বৈচিত্র্য আনার ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে। একই দিনে বিরিয়ানি, মাটন চাপ বা চিকেন বাটার মশালা রান্না করবেন না। যেদিন বিরিয়ানি করবেন সেদিন সঙ্গে রাখুন স্রেফ স্যালাড বা রায়তা। কড়াইতে ডুবো তেলে না ভেজে চেষ্টা করুন মাইক্রোওভেনে রান্না করার। সবজি বেশি মশলা দিয়ে রান্না না করে সেদ্ধ খাওয়ার চেষ্টা করুন। জানবেন, পুজোর এই ক'দিনই সেরা সময় সারা বছর শরীরের প্রতি যে অত্যাচার চলে তা শুধরে নেওয়ার।

বাড়িতে থাকুন বা প্যান্ডেল ঘুরুন, প্রচুর জল খান। খেতে পারেন গ্রিন টি-ও। এতে শরীর শোধিত হবে। সম্ভব হলে খেতে পারেন লস্যি বা ঝোল, ফলের রসও।

একটু ভাবলেই বোঝা যায়, আমাদের পুজোর নির্ঘন্ট বেশ বৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি। ষষ্ঠী, সপ্তমীতে খাওয়ার তেমন বাছবিচার না থাকলেও বেশিরভাগ পরিবারে অষ্টমীতে নিরামিষ খাওয়ার চল। অষ্টমীতেই অঞ্জলি দেওয়া রীতি। এজন্য সকাল থেকে উপোস থাকতে হয়। ফলে আগের রাতের ভুরি ভোজের কুপ্রভাব অনেকটা কেটে যায়। অঞ্জলি দেওয়ার পর ফল খাওয়ার জন্য শরীরে ডিটক্সিফিকেশন বা পরিশোধন হয় বেশ খানিকটা। অর্থাৎ ওই দিন পেট বিশ্রাম পায়। তারপর আবার নবমী দশমীতে চুটিয়ে খাওয়া। তাই খাওয়ার ব্যাপারে প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলতে হবে বুঝে শুনে।

কর্মরতা মায়েরা পুজোর ক'দিন তাঁদের শিশুদের মুখ বদলের জন্য ঘরে নানারকম সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর খাবার বানিয়ে দিতে পারেন। এতে বাচ্চাও খুশি হবে। মায়ের সঙ্গে বন্ডিংও বাড়বে। চেষ্টা করবেন, খাবারগুলোকে রঙিন করে তুলতে। যেমন গাজর, বিনস, টমেটো ইত্যাদি দিয়ে খাবার বানাতে।

যাঁরা ঘুরতে যাবেন

দূরে বেড়াতে গেলে ডায়েট চার্ট মেন্টেন করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তা বলে তো যা খুশি খেয়ে শরীর খারাপ করা কিংবা ওবেসিটি আরও বাড়ানোর কোনও মানে হয় না। তাই বাইরে ঘুরতে গিয়ে চেষ্টা করতে হবে লোকাল ফুড বা স্থানীয় খাবার। ওখানকার লোক রোজ যে খাবার খায় তা কখনওই খুব বেশি ক্যালরির বা তেল মশলাযুক্ত হয় না। যেমন, যদি রাজস্থানে যান, তবে ডাল-বাটি চুরমা টেস্ট করুন। ট্যুরিস্টদের জন্য বেশি মশলাযুক্ত রান্না করা খাবার মোটেও খাওয়া উচিত নয়। কারণ ওটা যে বাসি নয় তার কোনও প্রমাণ ট্যুরিস্টদের হাতে থাকে না। নতুন জায়গা দেখতে গেলে যতটা সম্ভব হেঁটে বেড়ানো উচিত। এতে ক্যালরি পুড়বে, শরীরও ভাল থাকবে। খাওয়া দাওয়া করুন তবে শরীরের কথা শুনুন। দুপুরে গুরুপাক হয়ে গেলে একদিন রাতে না খেলেও চলে।

আনন্দ উৎসব

জ্বেলে নাও প্রদীপখানি ঘরের কোণে

প্রিয়াংকাকে চিরকাল সবাই হিংসে করে। বিশেষ একটা কারণে। তার বাড়ি ঘরদোরের পারিপাট্যের জন্য। ইদানীং, 'হাউসপ্রাউড' অনেকেই। বেশিরভাগ মানুষই, যত ছোট বা বড় কিংবা মাঝারি বাড়ি হোক না কেন, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে ভালবাসেন। তা সত্ত্বেও কারও বাড়ি বেশি সুন্দর, কারও বা রুচিসম্পন্ন অথবা কারও বাড়িতে ওয়ামর্থ বেশি। কেন? রুচি এবং নিজস্বতার কারণে। সুন্দর, দামী জিনিস কিনে কিংবা ডিজাইনার দিয়ে বাড়ি সাজিয়ে ফেললেই হল না। বাড়ি হল এমনই এক জায়গা যেখানে নিজস্ব স্পর্শ, রুচির প্রকাশটাই বড়। সেখানেই বাড়ি হয়ে ওঠে বিশিষ্ট!

এই উৎসবের সময়ে আসুন আমরা আমাদের বাড়িও করে তুলি আকর্ষক, বিশিষ্ট। অনেকেই এই পুজোর আগে বাড়ির জন্য আপহোলস্ট্রি, পরদা এইসব বানান। যাঁরা বানালেন তাঁদের কথা এখানে আর আলোচনা করছি না। অন্যরা যদি পুরো আপহোলস্ট্রি এবং পরদা, চাদর ও অন্যান্য কাভারগুলো কেচে ধুয়ে পরিষ্কার করে ইস্ত্রি করে নেন তবে ভাল হয়। সেই সঙ্গে পুরো বাড়ির চরিত্র ফুটে ওঠে এই আনুষঙ্গিকীর মাধ্যমেই। চেষ্টা করুন এই উৎসবের সময় আমাদের দেশজ জিনিসগুলো

এবার পুজোয় নিজের ঘরে আনুন দেশজ বৈশিষ্ট্য। কী করে তা করবেন জানিয়েছেন সাবর্ণী দাস

হাইলাইট করতে। বুঝিয়ে বলি। ধরুন আপনার বাড়িতে ক্রিস্টালের ফুলদানি, কিংবা অ্যাশট্রে ব্যবহার হয়। এই দিন গুলোতে ওগুলো তুলে রাখুন। বদলে ব্যবহার করুন মাটির ডাঁস। এই ডাঁস একেবারে ক্রিস্টালের ফুলদানির মতো একই আকারের হতে হবে না। নানা মাপের মাটির হাঁড়ি, কলসি পাওয়া যায়। কিছু কিছু কলসিতে আলপনা দেওয়াও থাকে। পছন্দ মতো, আপনার ঘরে মানাবে এমন কলসি কিনবেন। প্রয়োজন হলে একরঙা কলসি কিনে তার উপর আপনার মনের মতো নকশাও করে নিতে পারেন। এবারে এগুলোতে ফুল সাজান।

টেবিলের উপরে তো ক্রিস্টালের অ্যাশট্রেটা সরিয়ে ফেললেন। এবারে ওই জায়গায় রাখুন পোড়ামাটির ছাইদানি। বিভিন্ন হস্তকলার দোকানে তো পাবেনই, পেতে পারেন সরকারি এম্পোরিয়ামেও। বাজার থেকে মাটির ছোট সরা বা একটু বড় বাটি কিনেও ছাইদানি বানাতে পারেন। দারুণ হবে। প্রয়োজনে ফুলদানির সঙ্গে মিলিয়ে একটু নকশাও করে নিতে পারেন তাতে। অনেকের বাড়িতে কাঁসা পিতলের অনেক বাসন থাকে। এই উৎসবের দিনে সেগুলোকে পাড়ুন। মেজে ঘষে ঝকঝকে করে ব্যবহার করুন। দেখবেন পিতলের কলসি হবে দারুণ সুন্দর ফুলদানি। এমনকী পিতলের বালতিতেও যদি এক ঝাড় রজনীগন্ধা রাখা যায় এক কোণে, সেই কোণটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, ভাবুন তো। সোফার ধারের টেবিলে পিতলের থালার উপরে সাজান নানা আনুষঙ্গিকী। পিতলের বাটিতে ভাসিয়ে দিন কিছু ফুল। মাঝখানে দিন একটি জেল মোমবাতি। দেখুন এবার কেমন লাগছে ওই অঞ্চলটা। আকর্ষক নিশ্চয়!

আমরা বইয়ের পাশে, টেবিলের উপরে, তাকের মধ্যেও রাখি নানা ধরনের টুকিটাকি সরঞ্জাম। বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা সরঞ্জাম বলে সাধারণত সেগুলো হয় পাঁচ মিশেলি। ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে ফেলুন সেগুলো। কাঁচের বা ক্রিস্টালের জিনিসগুলি সরিয়ে ফেলুন। রাখুন ডোকরা, পোড়ামাটি, ঝিনুক ইত্যাদি। বাড়িতে এই উৎসবের সময় আসবে নতুন একটা লুক। মেঝেতে নিশ্চয় আছে কার্পেট বা দরি। সেগুলোকে কয়েকদিনের জন্য সরিয়ে পাততে পারেন মাদুর। আজকাল বিভিন্ন মেলাতে, দোকানে দারুণ নকশা করা মাদুর পাওয়া যায়। সেগুলো এই সময়ে মানাবে খুব সুন্দর। ইদানীং সর্বত্র জরিপাড়ের নানা রঙের মাদুরও পাওয়া যাচ্ছে। মেদিনীপুরের সাধারণ ঠাসবুনোটের মাদুরও মানানসই রঙের কিনে ফেলুন। দেখতে ভাল লাগবে।

দেওয়ালের ছবির কথা কিন্তু ভুলে যাবেন না। নিশ্চিতভাবে দিশি কোনও ছবি বা দেওয়াল আনুষঙ্গিকীর কথা ভাবুন। আমাদের নিজস্ব বাঙালি পুরনো উডকাটের প্রিন্ট বাঁধিয়ে টাঙালে দারুণ মানাবে। যামিনী রায় তো বাঙালির চিরকালের ফেবারিট। কারও কাছে যদি আধুনিক ছবি বা প্রিন্ট থাকে তাও মানানসই হলে টাঙাতে পারেন। শান্তিনিকেতনের ছবি, ওয়াল হ্যাংঙ্গিং থাকলে সেগুলোও উপযুক্ত হবে। এছাড়া আমাদের কালীঘাটের পটই বা কম কীসের? আপনার বাড়ি এই উৎসবে কেমন হবে সেটা কি এবার কল্পনা করতে পারছেন? এখনও কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি। এবারে এধারে ওধারে রাখুন মোমবাতি। এখানে একটা টিকা দিই। অ্যারোমা ক্যান্ডেল বা অ্যারোমা লাইট কিন্তু আপনার অন্দরসজ্জায় একটা আলাদা মাত্রা দিতে পারে। তাই ঘরের কোণে অন্তত একটি করে অ্যারোমা বাতি দিন। একটা স্নিগ্ধ ভাব আসবে। এছাড়া নানা আকারের নানা রঙের পাবেন মোমবাতি। টেবিলের ওপর, তাকের পাশে, ঘরের কোণে লাগান মোমবাতি। মোমবাতির স্ট্যান্ড ব্যবহার করতে পারেন, এমনিও রাখতে পারেন। তবে দেখবেন জ্বলন্ত মোম যেন কোনও পাত্রের উপর রাখা হয়। মোমগুলো গলে যাতে সেই পাত্রেই পড়ে। চাইলে পোড়ামাটির নানা ধরনের প্রদীপ পাওয়া যায় আজকাল, তাতেও রাখতে পারেন মোমবাতিগুলো। ঘর সাজানো শেষ। অতিথি এলে কেবল জ্বেলে দিন মোমবাতিগুলি। প্রিয়াংকাই এবার আপনার বাড়িকে হিংসে করবে!

সোফার ধারের টেবিলে পিতলের থালার উপরে সাজান নানা আনুষঙ্গিকী। পিতলের বাটিতে ভাসিয়ে দিন কিছু ফুল। মাঝখানে দিন একটি জেল মোমবাতি। দেখুন এবার কেমন লাগছে ওই অঞ্চলটা। আকর্ষক নিশ্চয়!

ভূত ভবিষ্যৎ

রাশিফল আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ এই তিনমাস কার ভাগ্যে কী আছে জেনে নিন। লিখছেন শ্রীভৃগু (অনাদি)

মেষরাশি

সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে শিক্ষা, চাকরি ও ব্যবসায় নতুন সুযোগ লাভ হবে। অর্থপ্রাপ্তি। তবে স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেবেন। শুভরঙ : নীল, অশুভ রঙ : কালো; শুভ সংখ্যা : ৭; অশুভ সংখ্যা : ৪; শুভ খাবার আটার রুটি, ডাল, আনারস; অশুভ খাবার : মাংস, সামুদ্রিক মাছ, কচু।

বৃষরাশি

রাগ, জেদ বাড়তে পারে। প্রেমপ্রীতি, ভালবাসা থেকে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির সম্ভাবনা। বিয়ের সম্বন্ধ শুভ যদি পাত্র/পাত্রী চাকুরিজীবি হন। কাপড়, সুতো, আলুর ব্যবসা শুভ। পূর্ব ও উত্তর দিক শিক্ষা এবং পশ্চিমদিক ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ। শুভ রঙ : হলুদ, অশুভ রঙ : ধুসর; শুভ সংখ্যা : ৮,৪; অশুভ : ৪,৩; শুভ খাবার : মাছ, রুটি, দালিয়া, অশুভ : রসুন।

মিথুন রাশি

চর্মরোগ, বাত, রক্তচাপ, সুগার বাড়তে পারে। স্বাস্থ্যের কারণে শিক্ষা এবং কর্ম জীবনে কিছু ক্ষতি হতে পারে। প্রেম বিয়ে শুভ তবে বিচার করে। বৃশ্চিক, মকর রাশি বাদে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, সন্তানের কাছ থেকে বাধা পেতে পারেন। শুভরঙ : গোলাপি, অশুভ রঙ : কালো; শুভ সংখ্যা : ৩, ১, অশুভ সংখ্যা : ৭; শুভ খাবার : মাছ, অশুভ খাবার : ডিম।

ককর্ট রাশি

ধীর, স্থির হলে শুভ। শিক্ষা এবং কর্মজীবনে বিশেষত ব্যবসা বা চলচ্চিত্রে যুক্ত মানুষদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগবৃদ্ধি। আটকে থাকা অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মানসিক চাপ বৃদ্ধি। কোনও বাড়তি দায়িত্ব নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। দূরভ্রমণের সুযোগ, আত্মীয় সমাগম, ব্যয়বৃদ্ধি, গ্যাস, অম্বল বৃদ্ধি, হঠাৎ করে অস্ত্রোপচার হতে পারে। শুভ রঙ : সাদা, অশুভ রঙ : লাল; শুভ সংখ্যা : ১,অশুভ সংখ্যা : ৪; শুভ খাবার : নিরামিষ, অশুভ খাবার : আমিষ।

সিংহরাশি

খুব সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে। ভুল চলাফেরা, খাওয়ার কারণে খাবারের মধ্যে বিষক্রিয়া হতে পারে। ভাবনা চিন্তা করে অর্থলগ্নী করুন। শেয়ারে খেলা চলবে না। কৃষি প্রধান ব্যবসা শুভ হবে। আত্মীয়বিয়োগ হতে পারে। একক কর্মে উন্নতি, মহিলাদের ক্ষেত্রে নতুন কাজের সুযোগ। শুভ রঙ : আকাশি নীল, লাল, অশুভ রঙ : কালো; শুভ সংখ্যা : ৯, অশুভ সংখ্যা : ৭; শুভ খাবার : দুধ, দালিয়া, সোয়াবিন, অশুভ খাবার : টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি।

কন্যারাশি

সুগার, প্রেশার, কিডনি সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বিয়ের ক্ষেত্রে নতুনভাবে যোগাযোগ বৃদ্ধি। আগুন, জল, বিদ্যুৎ থেকে সাবধান। ব্যবসা ক্ষেত্র শুভ, হঠাৎ প্রাপ্তি হতে পারে। শুভ রঙ : সবুজ, অশুভ রঙ : নীল; শুভ সংখ্যা : ৬, অশুভ সংখ্যা : ৮; শুভ খাবার : রুটি, মাছ, দুধ, অশুভ খাবার : সামুদ্রিক মাছ, মাছের ডিম ও তেল।

তুলা রাশি

বাধার মধ্যে দিয়ে ভাগ্যে উন্নতির সম্ভাবনা। বিয়ে, প্রেম, ভালবাসার ক্ষেত্র শুভ। শিক্ষার্থীরা সতর্ক থাকবেন, হঠাৎ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। স্বাধীন পেশায় যুক্ত জাতক-জাতিকারা লাভবান হবেন। অর্থলগ্নী করে নতুন কিছু করার ক্ষেত্রে শুভ। শুভ রঙ : হলুদ, অশুভ রঙ : কালো, শুভ সংখ্যা : ৩, অশুভ সংখ্যা : ৬; শুভ খাবার : দালিয়া, দুধ, সবজি; অশুভ খাবার : মাংস, কাঁচা পেয়াজ।

বৃশ্চিক রাশি

মাসের শুরুতে আনন্দের মধ্যে থাকলেও শেষের দিকে মানসিক বিষন্নতা আসতে পারে। একাধিক বন্ধুলাভ, কথায় সংযত থাকবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, দূর ভ্রমণ শুভ। মহিলাদের ক্ষেত্রে সোনার জিনিস ক্রয় করার ক্ষেত্রে শুভ কিন্তু ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। কোনও বাড়তি দায়িত্ব বা ঝুঁকি না নিলেই ভাল। জল ও জলপথ থেকে সাবধান। শুভ সংখ্যা : ৪, ৬, অশুভ সংখ্যা : ৭। শুভ রঙ : সাদা, লাল, আকাশি; অশুভ রঙ : কালো; শুভ খাবার : নিরামিষ, অশুভ খাবার : সামুদ্রিক মাছ।

ধনু রাশি

বিয়ে ঠিক হয়ে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় আর্থিক ক্ষতি। বিশেষ করে কৃষি কাজে ও চামড়ার ব্যবসায় যুক্ত মানুষদের সময় খারাপ হতে পারে। নার্ভের অশুভ রক্ত সংক্রান্ত ব্যধি হতে পারে। নতুন কাজের সুযোগ ও সাফল্য। ডাক্তারি বা সি-এ ছাত্র-ছাত্রীদের বাইরে যাওয়ার যোগ। শুভ রঙ : গোলাপি, হলুদ, অশুভ রঙ : সবুজ; শুভ সংখ্যা :১, অশুভ সংখ্যা : ৪; শুভ খাবার : কলা, ডুমুর, থোড়, মোচা, অশুভ খাবার : পাঁঠার মাংস, মাছের ডিম।

মকর রাশি

স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করবেন। প্রেশার এবং নার্ভের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থলগ্নী করলে, বাধার মাধ্যমে সাফল্য আসবে। বিয়ের কথাবার্তার ক্ষেত্রে সময় শুভ। প্রেমে অশুভ। শিক্ষার্থীদের দেরিতে সাফল্য আসবে। কৃষি প্রধান ব্যবসায় সমস্যা। খাবার নিয়ে ব্যবসা শুভ। শুভ রঙ : বাদামি, আকাশি, অশুভ রঙ : লাল, কালো; শুভ সংখ্যা ৬, অশুভ সংখ্যা : ৪; শুভ খাবার : রুটি, তরকারি, রসুন, আদা, অশুভ খাবার : কুমড়ো, গাজর।

কুম্ভরাশি

বাধার মধ্যে দিয়ে সাফল্য আসবে। একা কাজ করলে শুভ। প্রেম-প্রীতি,ভালবাসা ও বিয়ের ক্ষেত্রে অশুভ। বন্ধুরা ক্ষতি করতে পারে। স্বাধীন প্রফেশনে যুক্ত যাঁরা, তাঁরা লাভবান হবেন। শেয়ার, লটারি থেকে প্রাপ্তিযোগ। শুভ রঙ : সাদা, অশুভ রঙ : ধূসর; শুভ খাবার : দুধ, সবজি, আটার রুটি, সোয়াবিন, অশুভ খাবার : মাছের তেল, ফুলকপি, ডিম।

মীন রাশি

একাধিক কাজের মধ্যে সাফল্যের সুযোগ এবং প্রাপ্তি। জল বা জল জাতীয় ব্যাবসায় লাভবান হবেন। বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে শুভ। আত্মীয় সমাগম, প্রণয় প্রাপ্তি, অল্প মানসিক চাপ, সাংসারিক জীবনে সন্তানের জন্য চিন্তা, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে শরীরের নিম্নাংশে অসুখ হতে পারে। বিয়ের কথাবার্তার ক্ষেত্রে শুভ। সন্তান লাভের ক্ষেত্রে প্রথম সন্তান কন্যা হলে বিশেষভাবে শুভ। শিক্ষাক্ষেত্র শুভ। শুভ রঙ : লাল, হলুদ, অশুভ রঙ : সবুজ; শুভ সংখ্যা ৩, অশুভ সংখ্যা : ৭; শুভ খাবার : নিরামিষ, অশুভ খাবার : আমিষ।

বর্ষার প্যাচপ্যাচে আবহাওয়ার যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে

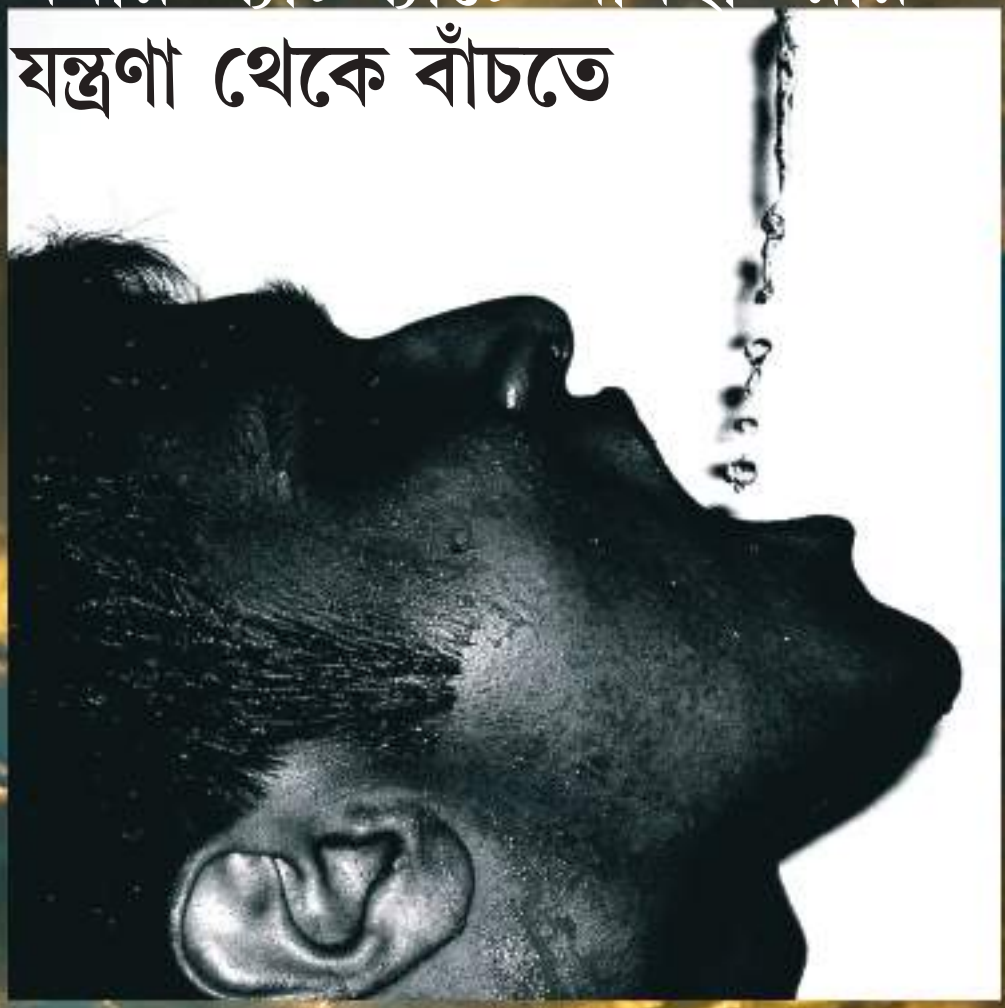

জল ছাড়াও আরও কিছু দরকার

হ্যাঁ, আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখুন

Lacolite-Z™

To be administered on the advice/under the supervision of a qualified Medical Practioner

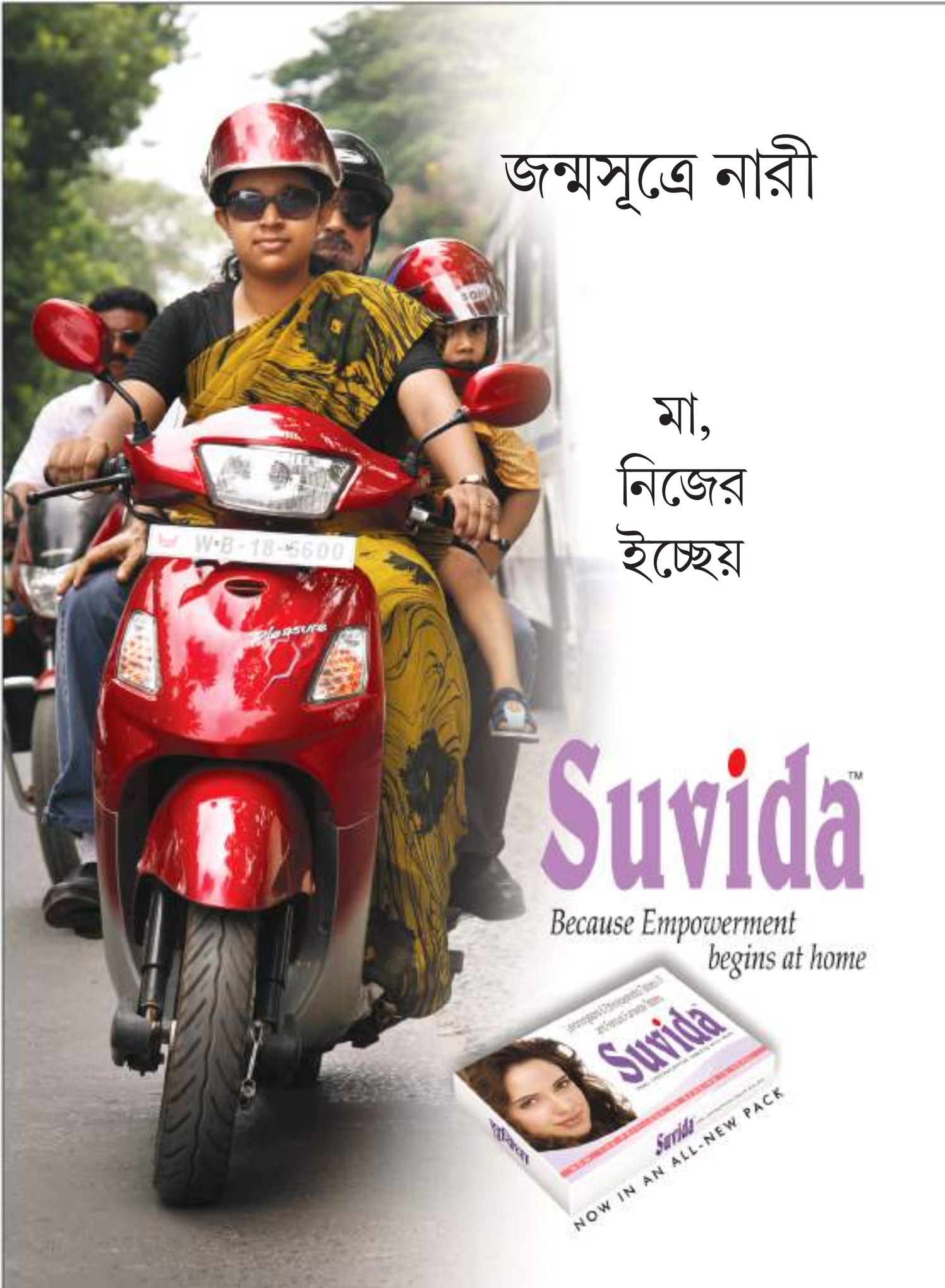

জন্মসূত্রে নারী
মা,
নিজের
ইচ্ছেয়
Suvida™
Because Empowerment
begins at home
Suvida
NOW IN AN ALL-NEW PACK